৭- সূরা আল-আ'রাফ

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ২০৬ আয়াত।

নাযিল হওয়ার স্থানঃ এ সূরা সর্বসম্মতভাবে মক্কী সূরা।

সূরার ফযীলতঃ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ প্রথম সাতটি সূরা গ্রহণ করবে সে আলেম হিসেবে গণ্য হবে"। [মুসনাদে আহমাদ: ৬/৮৫, ৬/৯৬]

সূরার নামকরণঃ এ সূরার নাম আল-আ'রাফ। এ নামকরণ এ জন্যই করা হয়েছে যে, এ সূরার ৪৬ ও ৪৮ নং আয়াতদ্বয়ে আল-আ'রাফ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ নামকরণের অর্থঃ এটা এমন একটি সূরা যাতে আ'রাফবাসীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

।। রহমান, রহীম আল্লাহ্‌র নামে ।।

১. আলিফ, লাম, মীম, সাদ(১)।

২. এ কিতাব(২) আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে, সুতরাং আপনার মনে যেন এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ(৩) না থাকে। যাতে আপনি এর দ্বারা সতর্ক করতে পারেন(৪)। আর তা মুমিনদের

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

الٓمّٓصٓ ۝١

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۝٢

---

(১) এ হরফগুলোকে 'হুরুফে মুকাত্তা'আত' বলে। এ সম্পর্কে সূরা আল-বাকারার প্রথমে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(২) কিতাব বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে সবচেয়ে স্বচ্ছ মত হল- পবিত্র কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। [বাগভী] কারো কারো মতে এখানে শুধু এ সূরার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

(৩) 'হারাজ' হবার মানে হচ্ছে এই যে, বিরোধিতা ও বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে নিজের পথ পরিষ্কার না দেখে মানুষের মন সামনে এগিয়ে চলতে পারে না; থেমে যায়। তাই মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেন, এখানে 'হারাজ' বলে 'সন্দেহ' বুঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়বস্তুকে 'দাইকে সদর' শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন, সূরা আল-হিজরঃ ৯৭, সূরা আন্-নাহলঃ ১২৭, সূরা আন্-নামলঃ ৭০, সূরা হুদঃ ১২।

(৪) এ আয়াতে কাদেরকে সতর্ক করতে হবে তা বলা হয়নি। অন্য আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ বলেন, "এবং বিতণ্ডাপ্রিয় সম্প্রদায়কে তা দ্বারা সতর্ক করতে

জন্য উপদেশ।

৩. তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর⁽¹⁾।

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝٣

৪. আর এমন বহু জনপদ রয়েছে, যা আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। তখনই আমাদের শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল রাতে অথবা দুপুরে যখন তারা বিশ্রাম করছিল⁽²⁾।

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ۝٤

পারেন।"[মারইয়াম: ৯৭] আরও বলেন, "বস্তুত এটা আপনার রব-এর কাছ থেকে দয়াস্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক কওমকে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে;"[আল-কাসাস:৪৬] আরও বলেন, "বরং তা আপনার রব হতে আগত সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন, যাদের কাছে আপনার আগে কোন সতর্ককারী আসেনি, হয়তো তারা হিদায়াত লাভ করবে।" [সূরা আস-সাজদাহ:৩] অনুরূপভাবে এ আয়াতে কিসের থেকে সতর্ক করতে হবে তাও বলা হয়নি। অন্যত্র তা বলে দেয়া হয়েছে, যেমন, "তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য" [সূরা আল-কাহাফ:২] "অতঃপর আমি তোমাদেরকে লেলিহান আগুন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি।" [সূরা আল-লাইল:১৪] এ আয়াতে ভীতিপ্রদর্শন এবং সুসংবাদ প্রদান একসাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভীতিপ্রদর্শন কাফেরদের জন্য আর সুসংবাদ মুমিনদের জন্য। [আদওয়াউল বায়ান]

(১) অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনকেই নিজের পথ প্রদর্শক হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে যে হিদায়াত ও পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন একমাত্র তারই অনুসরণ করতে হবে। যারাই আল্লাহকে বাদ দিয়ে এবং আল্লাহ্‌র পাঠানো নবীর আদর্শ অনুসরণ না করে অন্যের কাছ থেকে কিছু নিতে চেষ্টা করবে, তারাই আল্লাহ্‌র হুকুমকে বাদ দিয়ে অন্যের হুকুম গ্রহণ করল। [ইবন কাসীর]

(২) পূর্ববর্তী লোকদের উপর রাতে বা দুপুরে যে শাস্তি এসেছিল তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষদেরকে সতর্ক করছেন। অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে, "তবে কি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের উপর রাতে আসবে, যখন তারা থাকবে গভীর ঘুমে? নাকি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে

৫. অতঃপর যখন আমাদের শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয়েছিল, তখন তাদের দাবী শুধু এই ছিল যে, তারা বলল, ‘নিশ্চয় আমরা যালিম ছিলাম(১) ।’

فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝٥

৬. অতঃপর যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছিল অবশ্যই তাদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করব এবং রাসূলগণকেও অবশ্যই আমরা জিজ্ঞেস করব(২) ।

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ۝٦

গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের উপর আসবে দিনের বেলা, যখন তারা খেলাধুলায় মেতে থাকবে?”[সূরা আল-আ'রাফ: ৯৭-৯৮] আরও বলেন, “বলুন, ‘তোমরা আমাকে জানাও, যদি তাঁর শাস্তি তোমাদের উপর রাতে অথবা দিনে এসে পড়ে, তবে অপরাধীরা তার কোনটিকে তাড়াতাড়ি পেতে চায়” [সূরা ইউনুস:৫০] বিশেষ করে যারাই খারাপ কুটকৌশল ও ষড়যন্ত্র করেছে তাদের পরিণতি যে কি ভয়াবহ হতে পারে সে ব্যাপারেও অন্যত্র আল্লাহ্ সাবধান করেছেন, “যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না অথবা তাদের উপর আসবে না শাস্তি এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধিও করবে না? অথ বা চলাফেরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? অতঃপর তারা তা ব্যর্থ করতে পারবে না । অথবা তাদেরকে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না? নিশ্চয় তোমাদের রব অতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু” । [আন-নাহল:৪৫-৪৬]

(১) অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন । আল্লাহ্ বলেন, “আর আমরা ধ্বংস করেছি বহু জনপদ, যার অধিবাসীরা ছিল যালেম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি । তারপর যখন তারা আমাদের শাস্তি টের পেল তখনই তারা সেখান থেকে পালাতে লাগল । ‘পালিয়ে যেও না এবং ফিরে এসো যেখানে তোমরা বিলাসিতায় মত্ত ছিলে ও তোমাদের আবাসগৃহে, যাতে এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় ।”[সূরা আল-আম্বিয়া: ১১-১৩]

(২) অর্থাৎ কেয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে, আমি তোমাদের কাছে রাসূল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? নবীগণকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ যেসব বার্তা ও বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো আপনারা নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌঁছিয়েছেন কি না? এ আয়াতে রাসূলদেরকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে এবং প্রেরিত লোকদেরকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে তা বর্ণনা করা হয়নি । তবে কুরআনের অন্যত্র সেটা বর্ণিত হয়েছে । যেমন প্রথমটি সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, “স্মরণ করুন, যেদিন আল্লাহ্

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِينَ ۝٧

৭. অতঃপর অবশ্যই আমরা তাদের কাছে পূর্ণ জ্ঞানের সাথে তাদের কাজগুলো বিবৃত করব, আর আমরা তো অনুপস্থিত ছিলাম না(১) ।

রাসূলগণকে একত্র করবেন এবং জিজ্ঞেস করবেন, 'আপনারা কি উত্তর পেয়েছিলেন?" [সূরা আল-মায়িদাহ:১০৯] আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, "আর সেদিন আল্লাহ্ এদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা রাসূলগণকে কী জবাব দিয়েছিলে?" [সূরা আল-কাসাস:৬৫] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন যে, তিনি মানুষদেরকে তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, "কাজেই শপথ আপনার রবের! অবশ্যই আমরা তাদের সবাইকে প্রশ্ন করবই, সে বিষয়ে, যা তারা আমল করত ।" [সূরা আল-হিজর:৯২-৯৩]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেনঃ কেয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি আল্লাহ্র বাণী পৌঁছিয়েছি কি না? তখন তোমরা উত্তরে কি বলবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ আমরা বলব, আপনি আল্লাহ্র বাণী আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন । একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'হে আল্লাহ্, আপনি সাক্ষী থাকুন' । [মুসলিমঃ ১২১৮]

অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেনঃ আমি তাঁর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়েছি কি না । আমি উত্তরে বলবঃ পৌঁছিয়েছি । কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচেষ্ট হও যে, যারা এখন উপস্থিত রয়েছ, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেয় । [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪]

(১) আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে বলছেন যে, তিনি তাঁর বান্দারা ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বহীন যা করত বা বলত সবকিছু সম্পর্কে কিয়ামতের মাঠে বিস্তারিত জানাবেন । কারণ, তিনি সবকিছু দেখছেন, কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই, কোন কিছু সম্পর্কেই তিনি বেখবর নন । বরং তিনি চোখের খিয়ানত ও অন্তরের গোপন ভেদ সম্পর্কেও অবগত । আল্লাহ্ বলেন, "তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না । মাটির অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোন বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই ।"[সূরা আল-আন'আম:৫৯] [ইবন কাসীর] সুতরাং আল্লাহ্ হাশরের মাঠে তাদেরকে যা জানাবেন তা জ্ঞানের ভিত্তিতেই জানাবেন । দুনিয়াতে যা কিছুই ঘটেছে সবই তাঁর জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে । সবকিছু তিনি জানার পরও তাঁর ফেরেশতাদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন । অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আপনি কি লক্ষ্য করেন না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠ জন হিসেবে তিনি

৮. আর সেদিন ওজন(১) যথাযথ হবে(২) । | وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

উপস্থিত থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক তিনি তো তাদের সংগেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন । তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত ।" [সূরা আল-মুজাদালাহ:৭] অন্যত্র বলেন, "তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে নির্গত হয় আর যা আসমান থেকে নাযিল হয় এবং যা কিছু তাতে উত্থিত হয়" [সূরা সাবা:২] আরও বলেন, "তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা থেকে বের হয় এবং আসমান হতে যা কিছু নামে ও আসমানে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন---তিনি (জ্ঞানে) তোমাদের সংগে আছেন" [সূরা আল-হাদীদ:৪] আরও বলেন, "আর আপনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন এবং আপনি সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা-ই তিলাওয়াত করেন এবং তোমরা যে কাজই কর না কেন, আমরা তোমাদের সাক্ষী থাকি- যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। আর আসমানসমূহ ও যমীনের অণু পরিমাণও আপনার রবের দৃষ্টির বাইরে নয় এবং তার চেয়ে ক্ষুদ্রতর বা বৃহত্তর কিছুই নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই" [সূরা ইউনুস:৬১] [আদওয়াউল বায়ান]

(১) সেদিনের সে দাঁড়িপাল্লায় কোন অপরাধীর অপরাধ বাড়িয়ে দেয়া হবে না। আর কোন নেককারের নেক কমিয়ে দেয়া হবে না। [আদওয়াউল বায়ান] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ সেটা বলেছেন, "আর কেয়ামতের দিনে আমরা ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব, সুতরাং কারো প্রতি কোন যুলুম করা হবে না এবং কাজ যদি শস্য দানা পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমরা উপস্থিত করব;" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৪৭] তবে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কোন নেক বান্দার আমলকে বহুগুণ বর্ধিত করবেন। আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। আর কোন পুণ্য কাজ হলে আল্লাহ্ সেটাকে বহুগুণ বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ্ তাঁর কাছ থেকে মহাপুরস্কার প্রদান করেন ।" [সূরা আন-নিসা:৪০] অনুরূপভাবে 'হাদীসে বিতাকাহ' নামে বিখ্যাত হাদীসেও [দেখুন, ইবন মাজাহ: ৪৩০০; তিরমিযী: ২১২৭] সেটা বর্ণিত হয়েছে।

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "সেদিন যে ভাল-মন্দ কাজকর্মের ওজন হবে তা সত্য-সঠিকভাবেই হবে ।" এতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে যে, যেসব বস্তু ভারী, সেগুলোর ওজন ও পরিমান হতে পারে। মানুষের ভাল-মন্দ কাজকর্ম কোন জড় পদার্থ নয় যে, এগুলোকে ওজন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কাজকর্মের ওজন কিরূপে করা হবে? উত্তর এই যে, প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। অতএব, আমরা যা ওজন করতে পারি না আল্লাহ্ তা'আলাও তা ওজন করতে পারবেন, এটা বিচিত্র কিছু নয়। দ্বিতীয়তঃ আজকাল জগতে ওজন করার নতুন নতুন যন্ত্র আবিস্কার হয়েছে যাতে দাঁড়িপাল্লা, স্কেলকাঁটা ইত্যাদির কোন প্রায়োজন নেই। এসব নবাবিস্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল এমন বস্তুও ওজন করা

فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝٨

সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে⁽¹⁾ ।

যায়, যা ইতোপূর্বে ওজন করার কল্পনাও করা যেত না । আজকাল বাতাসের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওজন করা যায় । এমনকি শীত-গ্রীষ্ম পর্যন্ত ওজন করা হয় । এগুলোর মিটারই এদের দাঁড়িপাল্লা । যদি আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম শক্তি-বলে মানুষের কাজকর্ম ওজন করে নেন, তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই । হাদীসে রয়েছে যে, 'যদি কোন বান্দার ফরয কাজসমূহে কোন ক্রুটি পাওয়া যায়, তবে রাব্বুল 'আলামীন বলবেনঃ দেখ, তার নফল কাজও আছে কি না । নফল কাজ থাকলে ফরযের ক্রুটি নফল দ্বারা পূরণ করা হবে ।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৬৫]

আমলের ওজন পদ্ধতিঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'কেয়ামতের দিন কিছু মোটা লোক আসবে । তাদের মূল্য আল্লাহ্র কাছে মশার পাখার সমানও হবে না । এ কথার সমর্থনে কুরআনুল কারীমের এ আয়াত পাঠ করলেন । ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ -অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আমি তাদের কোন ওজন স্থির করবো না ।' [বুখারীঃ ৪৪৫২, মুসলিমঃ ২৭৮৫] আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর প্রশংসায় বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তার পা দু'টি বাহ্যতঃ যতই সরু হোক, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, কেয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় তার ওজন ওহূদ পর্বতের চাইতেও বেশী হবে ।' [মুসনাদে আহমাদ:১/৪২০] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'দু'টি বাক্য উচ্চারণের দিক দিয়ে খুবই হাল্কা; কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহ্র কাছে অতি প্রিয় । বাক্য দু'টি হচ্ছে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী', 'সুবহানাল্লাহিল আযীম' । [বুখারীঃ ৭৫৬৩] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ 'সুব্হানাল্লাহ্' বললে আমলের দাঁড়িপাল্লার অর্ধেক ভরে যায় আর 'আল্হামদুলিল্লাহ্' বললে বাকী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায় । [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/২৬০, ৫/৩৬৫; সুনান দারমীঃ ৬৫৩] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমলের ওজনের বেলায় কোন আমলই সচ্চরিত্রতার সমান ভারী হবে না ।' [আবু দাউদঃ ৪৭৯৯; তিরমিযীঃ ২০০৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়, তার আমলের ওজনে দু'টি কিরাত রেখে দেয়া হবে [বুখারীঃ ১২৬১] । অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এই কিরাতের ওজন হবে ওহূদ পাহাড়ের সমান ।' [মুসলিমঃ ৬৫৪] কেয়ামতে আমলের ওজন সম্পর্কে এ ধরণের বহু হাদীস রয়েছে ।

(১) মানুষের জীবনের সমগ্র কার্যাবলী দু'টি অংশে বিভক্ত হবে । একটি ইতিবাচক বা সৎকাজ এবং অন্যটি নেতিবাচক বা অসৎকাজ । ইতিবাচক অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে সত্যকে জানা ও মেনে নেয়া এবং সত্যের অনুসরণ করে সত্যের খাতিরে কাজ করা । আখেরাতে এটিই হবে ওজনদার, ভারী ও মূল্যবান । আর সে মূল্যবান কাজের

وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِـَٔايَٰتِنَا يَظۡلِمُونَ ⑨

৯. আর যাদের পাল্লা হাল্‌কা হবে, তারাই সে সব লোক, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে(১), যেহেতু তারা আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি যুলুম করত।

وَلَقَدۡ مَكَّنَّٰكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيهَا مَعَٰيِشَۗ قَلِيلٗا مَّا تَشۡكُرُونَ ⑩

১০. আর অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থাও করেছি; তোমরা খুব অল্পই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর(২)।

দ্বিতীয় রুকূ'

وَلَقَدۡ خَلَقۡنَٰكُمۡ ثُمَّ صَوَّرۡنَٰكُمۡ ثُمَّ قُلۡنَا لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ

১১. আর অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে

ফলাফলও মূল্যবান হবে। এ আয়াতে তা উল্লেখ না হলেও অন্য আয়াতে সেটা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন, “অতঃপর যার পাল্লাসমূহ ভারী হবে, সে তো থাকবে সন্তোষজনক জীবনে।” [সূরা আল-কারি‘আহ্‌:৬-৭] অর্থাৎ জান্নাতে। অন্যদিকে সত্য থেকে গাফিল হয়ে অথবা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ নিজের নফস-প্রবৃত্তি বা অন্য মানুষের ও শয়তানের অনুসরণ করে অসত্য পথে যা কিছুই করে, তা সবই নেতিবাচক অংশে স্থান লাভ করবে। আর এ নেতিবাচক অংশটি কেবল যে মূল্যহীন হবে তাই নয়, বরং এটি মানুষের ইতিবাচক অংশের মর্যাদাও কমিয়ে দেবে। কাজেই মানুষের জীবনের সমুদয় কার্যাবলীর ভাল অংশ যদি তার মন্দ অংশের ওপর বিজয় লাভ করে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে অনেক কিছু দেবার পরও তার হিসেবে কিছু না কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবেই আখেরাতে তার সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

(১) এখানে ক্ষতি বলতে কি তা বলা হয়নি। অন্য আয়াতে সেটা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেন, “আর যার পাল্লাসমূহ হাল্‌কা হবে, তার স্থান হবে ‘হা-ওয়িয়াহ্‌’, আর আপনাকে কিসে জানাবে সেটা কী? অত্যন্ত উত্তপ্ত আগুন” [সূরা আল-কারি‘আহ: ৮-১১] আরও বলেন, “আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়” [সূরা আল-মুমিনূন: ১০৩-১০৪]

(২) মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আল্লাহ্‌ তা‘আলা ভূ-পৃষ্ঠে সঞ্চিত রেখেছেন। কাজেই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌ তা‘আলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু মানুষ গাফেল হয়ে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং পার্থিব দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সুরে বলা হয়েছেঃ “তোমরা খুব কম লোকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।”

ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ (١١)

সৃষ্টি করেছি, তারপর আমরা তোমাদের আকৃতি প্রদান করেছি(১), তারপর আমরা ফিরিশ্‌তাদেরকে বললাম, আদমকে সিজ্‌দা কর। অতঃপর ইবলীস ছাড়া সবাই সিজ্‌দা করল। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হল না।

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ (١٢)

১২. তিনি বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কি তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি সিজদা করলে না?' সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন(২)।'

قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّٰغِرِينَ (١٣)

১৩. তিনি বললেন, 'তাহলে তুমি এখান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে, এটা হতে পারে না। সুতরাং তুমি বের হয়ে যাও, নিশ্চয়

---

(১) এ আয়াতের তাফসীরে ইবন আব্বাস বলেন, এখানে সৃষ্টি করার অর্থ প্রথমে আদমকে সৃষ্টি করা। আর আকৃতি প্রদানের কথা বলে তার সন্তানদেরকে বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] মুজাহিদ বলেন, এখানে সৃষ্টি করার কথা বলে আদম এবং আকৃতি প্রদানের কথা বলে, আদমের সন্তানদেরকে আদমের পৃষ্ঠে আকৃতি প্রদানের কথা বোঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ইবলীসকে আল্লাহ্ তা'আলা আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর যদি ইবলীসকে সমস্ত জিন জাতির পিতা বলা হয়, তখন তো এ ব্যাপারে আর কোন কথাই থাকে না। কারণ অন্যান্য আয়াতেও জিন জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "আর এর আগে আমরা সৃষ্টি করেছি জিনদেরকে অতি উষ্ণ নির্ধুম আগুন থেকে" [সূরা আল-হিজর:২৭] তাছাড়া অন্যত্র আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, জিন জাতিকে 'মারেজ' থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর 'মারেজ' হচ্ছে, নির্ধুম অগ্নিশিখা। আল্লাহ্ বলেন, "এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন নির্ধূম আগুনের শিখা হতে।" [সূরা আর-রহমান: ১৫] [আদওয়াউল বায়ান]

তুমি অধমদের(১) অন্তর্ভুক্ত ।’

---

(১) ‘সাগেরীন’ শব্দটি বহুবচন। এক বচন হলো ‘সাগের’। অর্থ লাঞ্ছনা ও অবমাননার মধ্যে নিজেকে নিয়ে রাখা। শব্দটি মূল হচ্ছে, ‘সাগার’ যার অর্থ, সবচেয়ে কঠিন লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হওয়া। [আদওয়াউল বায়ান] অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেই লাঞ্ছনা, অবমাননা ও নিকৃষ্টতর অবস্থা অবলম্বন করে। সুতরাং আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর বান্দা ও সৃষ্টি হয়েও তোমার অহংকারে মত্ত হওয়া এবং তুমি নিজের মর্যাদা ও শ্রেষ্টত্বের যে ধারণা নিজেই তৈরী করে নিয়েছ তার দৃষ্টিতে তোমার রবের হুকুম তোমার জন্য অবমাননাকর মনে হওয়া ও সে জন্য তা অমান্য করার অর্থ নিজেই নিজেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করতে দেয়া। শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা অহমিকা, মর্যাদার ভিত্তিহীন দাবী এবং কোন জন্মগত স্বতঃসিদ্ধ অধিকার ছাড়াই নিজেকে অযথা শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন মনে করা তোমাকে বড়, শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাশীল করতে পারে না। বরং এর ফলে তুমি মিথ্যুক, লাঞ্ছিত ও অপমানিতই হবে এবং তোমার এ লাঞ্ছনা ও অবমাননার কারণ হবে তুমি নিজেই। কুরআনের অন্যত্র মিথ্যা অহঙ্কারের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে যে, অহঙ্কারী আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ ও তাঁর নিদর্শনাবলী বুঝতে অক্ষম হয়ে যায়। সে তা থেকে হিদায়াত পায় না। আল্লাহ্ বলেন, “যমীনে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমার নিদর্শনসমূহ থেকে আমি তাদের অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব। আর তারা প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সৎপথ দেখলেও সেটাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভুল পথ দেখলে সেটাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে।” [সূরা আল-আ'রাফ: ১৪৬] আবার কোথাও বলা হয়েছে যে, অহঙ্কারীর ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আল্লাহ্ বলেন, “কাজেই তোমরা দরজাগুলো দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ী হয়ে। অতঃপর অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!” [সূরা আন-নাহল: ২৯] আরও বলেন, “অহংকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?” [সূরা আয-যুমার:৬০] আরও বলেন, “বলা হবে, ‘জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। অতএব অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!” [সূরা আয-যুমার:৭২] “নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার ‘ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।” [সূরা গাফির:৬০] আবার বলা হয়েছে যে, অহঙ্কারীদের ঈমান নসীব হয় না। আল্লাহ্ বলেন, “শুধু তারাই আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, যারা সেটার দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হলে সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আর তারা অহংকার করে না।” [সূরা আস-সাজদাহ:১৫] আরও বলেন, “তাদেরকে -অপরাধীদেরকে- ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই’ বলা হলে তারা অহংকার করত।” [সূরা আস-সাফফাত:৩৫] আবার কোথাও এসেছে যে, আল্লাহ্ অহঙ্কারীকে ভালবাসেন না। “নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।” [সূরা আন-নাহল:২৩] [আদওয়াউল বায়ান]

১৪. সে বলল, 'আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে ।'

قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤﴾

১৫. তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত(১) ।'

قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾

১৬. সে বলল, 'আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, সে কারণে অবশ্যই অবশ্যই আমি আপনার সরল পথে মানুষের জন্য বসে থাকব(২) ।'

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾

---

(১) এ আয়াতে ইবলীসকে দেয়া সময় সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি । শুধু এটুকু বলা হয়েছে যে, তোমাকে অবকাশ দেয়া হল । কিন্তু অন্যান্য সূরায় এ অবকাশ নির্ধারণ করে বলা হয়েছে, ﴿إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ﴾ [সূরা আল-হিজরঃ ৩৮, সোয়াদঃ ৮১] এ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, ইবলীসের প্রার্থিত অবকাশ কেয়ামত পর্যন্ত দেয়া হয়নি, বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে । অধিকাংশ আলেমদের নিকট তার অবকাশের মেয়াদ হচ্ছে শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক দেয়া পর্যন্ত ।[আদওয়াউল বায়ান] সুদ্দি বলেন, তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়নি । কারণ, যখন শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক দেয়া হবে, তখন ﴿فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ﴾ বা আসমান ও যমীনের সবাই মারা পড়বে, আর তখন ইবলীসও মারা যাবে । [তাবারী]

আলোচ্য ইবলিসের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, কাফেরদের দো'আ কবুল করা হয় । অথচ অন্যত্র আল্লাহর বাণী ﴿وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ﴾ "কাফেরদের দো'আ তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবেই" [সূরা আর-রা'দঃ ১৪] এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, কাফেরের দো'আ কবুল হয় না । এর উত্তর এই যে, দুনিয়াতে কাফেরের দো'আও কবুল হতে পারে । ফলে ইবলীসের মত মহা কাফেরের দো'আও কবুল হয়ে গেছে । কিন্তু আখেরাতে কাফেরের দো'আ কবুল হবে না । উল্লেখিত আয়াত আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত । দুনিয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই । আর কাফেরের কোন কোন দো'আ কবুল হয় বলে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা মাযলূমের দো'আ থেকে বেঁচে থাক, যদিও সে কাফের হয়; কেননা তার দো'আ কবুলের ব্যাপারে কোন পর্দা নেই ।' [মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৫৩; দিয়া আল-মাকদেসী, হাদীস নং ২৭৪৮]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'শয়তান আদম সন্তানের যাবতীয় পথে বসে পড়ে । তার ইসলামের পথে বসে পড়ে তাকে বলেঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে এবং আপন দ্বীন ও বাপ-দাদার দ্বীন ত্যাগ করবে? তারপর সে

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ
وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾

১৭. 'তারপর অবশ্যই আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে ও তাদের পিছন থেকে, তাদের ডানদিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে(১) এবং

নাফরমানী করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর শয়তান তার হিজরতের পথে বসে পড়ে তাকে বলতে থাকেঃ তুমি হিজরত করে তোমার ভূমি ও আকাশ ত্যাগ করবে? লম্বা পথে মুহাজিরের উদাহরণ তো হলো ঘোড়ার মত। কিন্তু সে তার নাফরমানী করে হিজরত করে। তারপর শয়তান তার জেহাদের পথে বসে বলতে থাকেঃ তুমি কি জিহাদ করবে এতে নিজের জান ও মালের ক্ষতির আশংকা, যুদ্ধ করবে এতে তুমি মারা পড়বে, তারপর তোমার স্ত্রীর বিয়ে হয়ে যাবে, সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে। তাতেও সে শয়তানের নাফরমানী করে জিহাদ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'যে ব্যক্তি এতটুকু করতে পারবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো মহান আল্লাহর জন্য যথাযথ হয়ে পড়ে, যদি কাউকে হত্যা করা হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র উপর যথাযথ হয়ে পড়ে। আর যদি ডুবেও যায় তবুও আল্লাহ্র জন্য যথাযথ হয়ে পড়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো অথবা যদি তার সফর করার জন্তু থেকে পড়ে সে মারা যায় তবুও আল্লাহ্র উপর যথাযথ হয়ে পড়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৪৮৩]

(১) মানুষের উপর শয়তানের হামলা শুধু চতুর্দিকেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আরো ব্যাপক। আলোচ্য আয়াতে ইবলীস আদম সন্তানদের উপর আক্রমণ করার জন্য চারটি দিক বর্ণনা করেছে- অগ্র, পশ্চাৎ, ডান ও বাম। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোন সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হল প্রত্যেক দিক ও প্রত্যেক কোণ থেকে। এভাবে হাদীসের এ বর্ণনাও এর পরিপন্থী নয় যে, শয়তান মানবদেহে প্রবেশ করে রক্তবাহী রগের মাধ্যমে। তারপর সমগ্র দেহে হস্তক্ষেপ করে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে সামনে থেকে আসার অর্থ, দুনিয়ায়। পশ্চাৎ দিক থেকে আসার অর্থ আখেরাতে। ডানদিক থেকে আসার অর্থ, নেককাজের মাধ্যমে আসা। আর বামদিক থেকে আসার অর্থ, গুনাহের দিক থেকে আসা। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] কাতাদাহ বলেন, ইবলীস মানুষের সামনে থেকে এসে বলে, পুনরুত্থান নেই, জান্নাত নেই, জাহান্নাম নেই। মানুষের পিছন দিক থেকে দুনিয়াকে তার কাছে চাকচিক্যময় করে তোলে এবং দুনিয়ার প্রতি লোভ লাগিয়ে সেদিক আহ্বান করতে থাকে। তার ডানদিক থেকে আসার অর্থ নেক কাজ করার সময় সেটা করতে দেরী করায়, আর বাম দিক থেকে আসার অর্থ, গোনাহ ও অপরাধমূলক কাজকে সুশোভিত করে দেয়, সেদিকে আহ্বান করে, সেটার প্রতি নির্দেশ দেয়। হে বনী আদম! শয়তান তোমার সবদিক থেকেই আসছে, তবে সে তোমার উপর দিক থেকে আসে না, কারণ, সে তোমার ও আল্লাহ্র রহমতের মধ্যে বাধা হতে পারে না। [তাবারী]

আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না⁽¹⁾ ।'

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

১৮. তিনি বললেন, 'এখান থেকে বের হয়ে যাও ধিকৃত, বিতাড়িত অবস্থায় ।মানুষের মধ্যে যারাই তোমার অনুসরণ করবে, অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব⁽²⁾ ।'

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ
شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

১৯. 'আর হে আদম! আপনি ও আপনার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করুন, অতঃপর যেথা হতে ইচ্ছা খান, কিন্তু এ গাছের ধারে-কাছেও যাবেন না, তাহলে আপনারা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন ।'

---

(১) শয়তান এটা বলেছিল তার ধারণা অনুসারে । সে মনে করেছিল যে, তারা তার আহ্বানে সাড়া দিবে, তার অনুসরণ করবে । যাতে সে তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে । আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র শয়তানের এ ধারণার কথা স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন । তিনি বলেন, "আর অবশ্যই তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মুমিন দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল" [সূরা সাবা:২০] [আদওয়াউল বায়ান] ইবন আব্বাস বলেন, এখানে মানুষদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ না থাকার কথা বলে, তাওহীদের কথা বোঝানো হয়েছে । অর্থাৎ আপনি তাদেরকে তাওহীদবাদী পাবেন না । [তাবারী]

(২) আয়াতে শয়তান ও শয়তানের অনুসারীদের দিয়ে জাহান্নাম ভর্তি করার কথা বলা হয়েছে । এ কথা অন্য আয়াতেও এসেছে, যেমন, "তিনি বললেন, 'তবে এটাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি-- 'অবশ্যই তোমার দ্বারা ও তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের সবার দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব ।" [সূরা ছোয়াদ ৮৪-৮৫] আরও এসেছে, "আল্লাহ্ বললেন, 'যাও, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয় জাহান্নামই হবে তোমাদের সবার প্রতিদান, পূর্ণ প্রতিদান হিসেবে । 'আর তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পার পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও ।' আর শয়তান ছলনা ছাড়া তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না ।" [সূরা আল-ইসরা: ৬৩-৬৪] আরও বলেন, "তারপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টকারীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অধোমুখী করে এবং ইব্লীসের বাহিনীর সকলকেও" [সূরা আশ-শু'আরা: ৯৪-৯৫] অনুরূপ অন্যান্য আয়াত । [আদওয়াউল বায়ান]

২০. তারপর তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, ‘পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশ্‌তা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হও, এ জন্যেই তোমাদের রব এ গাছ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।’

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا
مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ
الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ
الْخٰلِدِيْنَ ﴿٢٠﴾

২১. আর সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বলল, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের শুভাকাংখীদের একজন⁽¹⁾।’

وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢١﴾

২২. অতঃপর সে তাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করল। এরপর যখন তারা সে গাছের ফল খেল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের রব তাদেরকে ডেকে বললেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে এ গাছ থেকে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের উভয়ের প্রকাশ্য শত্রু?’

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا
وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَاۤ
اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَاۤ اِنَّ الشَّيْطٰنَ
لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٢﴾

---

(১) কাতাদা বলেন, শয়তান তাদের দু'জনের কাছে শপথের মাধ্যমে এগিয়ে এসে ধোঁকা দিয়েছিল। কখনও কখনও আল্লাহ্‌র উপর খাঁটি ঈমানদার ব্যক্তিও ধোঁকা খেয়ে থাকে। অনুরূপ এখানেও শয়তান তাদের দু'জনকে ধোঁকা দিয়েছিল। সে বলেছিল, ‘আমি তোমাদের আগে সৃষ্ট হয়েছি। আমি তোমাদের থেকে ভাল জানি। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব।’ কোন কোন মনীষী বলেন, কেউ আমাদেরকে আল্লাহর কথা বলে ধোঁকা দিলে আমরা ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। [তাবারী]

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. তারা বলল, ‘হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব(১)।’

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى
الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ﴿٢٤﴾

২৪. তিনি বললেন, ‘তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অন্যের শত্রু এবং যমীনে কিছুদিনের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।’

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. তিনি বললেন, ‘সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই তোমরা মারা যাবে। আর সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করা হবে(২)।’

তৃতীয় রুকূ‘

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ
وَرِيْشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ
اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. হে বনী আদম! অবশ্যই আমরা তোমাদের জন্য পোষাক নাযিল করেছি, তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকা ও বেশ-ভূষার জন্য। আর তাকওয়ার পোষাক(৩), এটাই

---

(১) কাতাদা বলেন, তারা দু’জন নিজেদের লজ্জাস্থান পরস্পর দেখতে পেত না। কিন্তু অপরাধের পর সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন, হে রব! যদি আমি তাওবা করি এবং ক্ষমা চাই তাহলে কি হবে আমাকে জানান? আল্লাহ্ বললেন, তাহলে আমি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো। কিন্তু ইবলীস ক্ষমা চাইলো না, বরং সে অবকাশ চাইল। ফলে আল্লাহ্ প্রত্যেককে তার প্রার্থিত বিষয় দান করলেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) ইবন কাসীর বলেন, এ আয়াতের অর্থ অন্য আয়াতের মত, যেখানে এসেছে, “আমরা মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা থেকেই পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব।” [সূরা ত্বা-হা: ৫৫]

(৩) لِبَاسُ التَّقْوٰى শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক পোষাক দ্বারা গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করা ও সাজ-সজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতি।

সর্বোত্তম(১)। এটা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, যাতে তারা

এ আল্লাহ্‌ভীতি পোষাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পায়। তাই পোষাকে যেন গুপ্তাঙ্গগুলি পুরোপুরি আবৃত হয়। উলঙ্গের মত দৃষ্টিগোচর না হয়। অহংকার ও গর্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই। অপব্যয় না থাকা চাই। মহিলাদের জন্য পুরুষের পোষাকের মত আর পুরুষের জন্য মহিলাদের পোষাকের মত না হওয়া চাই। পোষাকে বিজাতির অনুকরণ না হওয়া চাই। এর প্রত্যেকটির ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত আদম সন্তানকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ তোমাদের পোষাক আল্লাহ্ তা'আলার একটি মহান নেয়ামত। একে যথার্থ মূল্য দাও। এখানে মুসলিমদেরকে সম্বোধন করা হয়নি- সমগ্র বনী-আদমকে করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন ও পোষাক মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে। অতঃপর এর বিশদ বিবরণে তিন প্রকার পোশাকের উল্লেখ করা হয়েছে।

(এক) ﴿لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ﴾ -এখানে يُوَارِي শব্দটি مواراة থেকে উদ্ভুত, এর অর্থ আবৃত করা। আর سَوْآت শব্দটি سوءة এর বহুবচন, এর অর্থ মানুষের ঐসব অঙ্গ, যেগুলো খোলা রাখাকে মানুষ স্বভাবতই খারাপ ও লজ্জাকর মনে করে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে এমন একটি পোষাক সৃষ্টি করেছি, যা দ্বারা তোমরা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে পার। মুজাহিদ বলেন, আরবের কিছু লোক আল্লাহ্‌র ঘরের তাওয়াফ উলঙ্গ হয়ে সম্পাদন করত। আবার কোন কোন লোক যে পোষাক পরিধান করে তাওয়াফ করেছে সে পোষাক আর পরিধান করত না। এ আয়াতে তাদেরকেও উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [তাবারী]

(দুই) ﴿وَرِيْشًا﴾ -অর্থাৎ সাজ-সজ্জার জন্য মানুষ যে পোষাক পরিধান করে, তাকে ريش বলা হয়। অর্থ এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার জন্য তো সংক্ষিপ্ত পোষাকই যথেষ্ট হয়; কিন্তু আমি তোমাদেরকে আরো পোষাক দিয়েছি, যাতে তোমরা তা দ্বারা সাজ-সজ্জা করে বাহ্যিক দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পার। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এখানে 'রীশ' বলে 'সম্পদ' বোঝানো হয়েছে। [তাবারী] বাস্তবিকই পোষাক একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সম্পদ।

(তিন) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তৃতীয় এক প্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করে বলেছেনঃ ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ﴾ অর্থাৎ তা হচ্ছে তাকওয়ার পোষাক আর এটিই সর্বোত্তম পোষাক। ইবন আব্বাস ও উরওয়া ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমের তাফসীর অনুযায়ী তাকওয়ার পোষাক বলে সৎকর্ম ও আল্লাহ্‌ভীতি বুঝানো হয়েছে। এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভের উপায়। এ কারণেই এটি সর্বোত্তম পোষাক। কাতাদা বলেন, তাকওয়ার পোষাক বলে ঈমানকে বোঝানো হয়েছে। [তাবারী]

উপদেশ গ্রহণ করে(১) ।

২৭. হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে--যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল, সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য(২) বিবস্ত্র করেছিল(৩) । নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না । নিশ্চয় আমরা শয়তানকে তাদের অভিভাবক করেছি, যারা ঈমান আনে না ।

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ كَمَآ أَخۡرَجَ أَبَوَيۡكُم
مِّنَ ٱلۡجَنَّةِ يَنزِعُ عَنۡهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوۡءَٰتِهِمَآۚ إِنَّهُۥ
يَرَىٰكُمۡ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنۡ حَيۡثُ لَا تَرَوۡنَهُمۡۗ إِنَّا جَعَلۡنَا
ٱلشَّيَٰطِينَ أَوۡلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ ٢٧

২৮. আর যখন তারা কোন অশ্লীল আচরণ করে(৪) তখন বলে, 'আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এতে পেয়েছি এবং আল্লাহ্ও আমাদেরকে এরই নির্দেশ দিয়েছেন ।' বলুন, 'আল্লাহ্ অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না । তোমরা কি আল্লাহ্

وَإِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةٗ قَالُواْ وَجَدۡنَا عَلَيۡهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ
أَمَرَنَا بِهَاۗ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ أَتَقُولُونَ
عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٢٨

---

(১) অর্থাৎ মানুষকে এ তিন প্রকার পোষাক দান করা আল্লাহ্ তা'আলার শক্তির নিদর্শনসমূহের অন্যতম- যাতে মানুষ এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে ।

(২) শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা আঁচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর করেছে । তাই মানুষের সর্বপ্রথম মঙ্গল বিধানকারী শরী'আত গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা । সালাত, সিয়াম ইত্যাদি সবই এরপর ।

(৩) মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলে তার পোষাক খসে পড়েছিল । আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয় । শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে দূরে ঠেলে সাধারণ্যে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না ।

(৪) فحشاء ، فحش ও فاحشة এমন প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণমাত্রায় সুস্পষ্ট । [ফাতহুল কাদীর]

সম্বন্ধে এমন কিছু বলছ যা তোমরা জান না(১)?'

২৯. বলুন, 'আমার রব নির্দেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের(২)।' আর তোমরা প্রত্যেক সাজদাহ্ বা ইবাদতে তোমাদের লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ্‌কেই নির্ধারণ কর(৩) এবং তাঁরই আনুগত্যে

قُلْ اَمَرَ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۗ وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۗ ﴿٢٩﴾

---

(১) ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেসব লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায় লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কুরাইশ ছাড়া কোনো ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোন কুরাইশীর কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হত, না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করতে হত। এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেয়া কুরাইশদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ মহিলা অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণতঃ রাতের অন্ধকারে তাওয়াফ করত। তাদের নিকট এ শয়তানী কাজের যুক্তি হলো, যেসব পোষাক পরে আমরা পাপকাজ করি, সেগুলো পরিধান করে আল্লাহ্‌র ঘর প্রদক্ষিণ করা বেআদবী। এ জ্ঞানপাপীরা এ বিষয়টি বুঝত না যে, উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করা আরো বেশী বেআদবীর কাজ। হারামের সেবক হওয়ার সুবাদে শুধু কুরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল। এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়। [তাবারী] এতে বলা হয়েছেঃ তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করত, তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলতঃ আমাদের বাপ-দাদা ও মুরুব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরিকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরো বলত আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। প্রথমটি সত্য হলেও দ্বিতীয়টি নিঃসন্দেহে মিথ্যা।

(২) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যেসব মূর্খ উলঙ্গ তাওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র দিকে করে, আপনি তাদের বলে দিনঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা قسط এর নির্দেশ দেন। قسط এর আসল অর্থ ন্যায়বিচার ও সমতা। এখানে ঐ কাজকে বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ ত্রুটিও নেই এবং নির্দিষ্ট সীমার লঙ্ঘনও নেই। অর্থাৎ স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত। শরী'আতের সব বিধি-বিধানের অবস্থা তাই। এজন্য قسط শব্দের অর্থে যাবতীয় ইবাদাত, আনুগত্য ও শরী'আতের সাধারণ বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(৩) এখানে ইবাদতের সময় সবকিছু বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ইখলাসের সাথে আল্লাহকে উদ্দেশ্য নিতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে মাসজিদসমূহে যখন ইবাদত করা হয়। [মুয়াসসার] ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, এ আয়াতে 'কিয়ামুল ওয়াজহ' বলে অন্য আয়াত 'ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া' যা বুঝানো হয়েছে, তাই বোঝানো হয়েছে। এ সবের অর্থ

বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাক(১)। তিনি যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে(২)।

৩০. একদলকে তিনি হিদায়াত করেছেন। আর অপরদল, তাদের উপর পথ

فَرِيۡقًا هَدٰى وَفَرِيۡقًا حَقَّ عَلَيۡهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ

হচ্ছে, ইখলাসের সাথে যাবতীয় ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা। [ইসতিকামাহ ২/৩০৬] এখানে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে, ইবাদতের জন্য বিশেষ করে ইখলাসের সাথে ইবাদতের জন্য সবচেয়ে উত্তম স্থান হচ্ছে মাসজিদ, মাযার নয়। যেমনটি কোন কোন মানুষ মনে করে থাকে। [ইবন তাইমিয়্যাহ, ইকতিদায়ুস সিরাতিল মুস্তাকীম ১/৩৯২] মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ্ আয়াতের অর্থে বলেন, 'তোমরা তোমাদের চেহারাকে প্রতিটি মসজিদেই কিবলামূখী কর, যেখানেই সালাত আদায় কর না কেন'। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাকে এমনভাবে ডাক, যেন ইবাদাত খাঁটিভাবে তাঁরই জন্য হয়; এতে যেন অন্য কারো অংশীদারিত্ব না থাকে; এমন কি গোপন শির্ক অর্থাৎ লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই। এতে বোঝা গেল যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকেই শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। আন্তরিকতা ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আনুগত্যই যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে শুধুমাত্র আন্তরিকতাও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আতের অনুসরণ ব্যতীত গ্রহনযোগ্য নয়।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে জমায়েত হবে খালি পা, কাপড় বিহীন, খতনাবিহীন অবস্থায়। তারপর তিনি বললেনঃ "তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে" এখান থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়লেন। তারপর বললেনঃ 'মনে রেখ! কেয়ামতের দিন প্রথম যাকে কাপড় পরানো হবে, তিনি হলেন ইব্‌রাহীম। মনে রেখ! আমার উম্মতের কিছু লোককে নিয়ে আসা হবে তারপর তাদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন আমি বলবঃ হে রব! এরা আমার প্রিয় সাথীবৃন্দ। তখন বলা হবেঃ আপনি জানেন না তারা আপনার পরে কি নতুন পদ্ধতির আবিস্কার করেছে। তারপর আমি তা বলব যা নেক বান্দা বলেছিল, "আর আমি তাদের মাঝে যতদিন ছিলাম তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম, তারপর যখন আপনি আমাকে মৃত্যু দেন আপনিই তো তখন তাদের উপর খবরদার ছিলেন" তখন বলা হবেঃ আপনি তাদের কাছ থেকে চলে আসার পর থেকেই এরা তাদের পিছনে ফিরে গিয়েছিল। [বুখারীঃ ৪৬২৫, মুসলিমঃ ২৮৫৯]

اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে(১)। নিশ্চয় তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে তাদের অভিভাবক-রূপে গ্রহণ করেছিল এবং মনে করত(২) তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا

৩১. হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোষাক গ্রহণ

---

(১) এ আয়াতের সমর্থনে আরও আয়াত ও অনেক হাদীস এসেছে। সূরা আত-তাগাবুনের ২নং আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এটা তাক্‌দীরের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানুষকে কাফের ও মুমিন এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। কিন্তু মানুষ জানেনা সে কোনভাগে। সুতরাং তার দায়িত্ব হবে কাজ করে যাওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদীসেও তা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'তোমাদের কেউ কেউ এমন কাজ করে যে, বাহ্য দৃষ্টিতে সে জান্নাতের অধিবাসী অথচ সে জাহান্নামী। আবার তোমাদের কেউ কেউ এমন কাজ করে যে, বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় সে জাহান্নামী অথচ সে জান্নাতী। কারণ মানুষের সর্বশেষ কাজের উপরই তার হিসাব নিকাশ'। [বুখারীঃ২৮৯৮, ৪২০২, মুসলিমঃ ১১২, আহমাদ ৫/৩৩৫] অন্য হাদীসে এসেছে, 'প্রত্যেক বান্দাহ পুনরুত্থিত হবে সেটার উপর যার উপর তার মৃত্যু হয়েছে'। [মুসলিমঃ২৮৭৮]

(২) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এটা বর্ণনা করেছেন যে, কাফেররা শয়তানদেরকে তাদের অভিভাবক বানিয়েছে। তাদের এ অভিভাবকত্বের স্বরূপ হচ্ছে যে, তারা আল্লাহ্‌র শরী'আতের বিরোধিতা করে শয়তানের দেয়া মত ও পথের অনুসরণ করে থাকে। তারপরও মনে করে থাকে যে, তারা হিদায়াতের উপর আছে। অন্য আয়াতে যারা এ ধরণের কাজ করবে তাদেরকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। " বলুন, 'আমরা কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব কাজে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের? ওরাই তারা, 'পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকাজই করছে " [সূরা আল-কাহাফ: ১০৩-১০৪] [আদওয়াউল বায়ান] মূলত: শরী'আতের বিধি-বিধান সম্পর্কে মূর্খতা ও অজ্ঞতা কোন স্থায়ী ওযর নয়। যদি কেউ ভ্রান্ত পথকে বিশুদ্ধ মনে করে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা অবলম্বন করে, তবে সে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমার যোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে চেতনা, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান-বুদ্ধি এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে সে তা দ্বারা আসল ও মেকী এবং অশুদ্ধ ও শুদ্ধকে চিনে নেয়। অতঃপর তাকে এ জ্ঞান বুদ্ধির উপরই ছেড়ে দেননি, নবী প্রেরণ করেছেন এবং গ্রন্থ নাযিল করেছেন। এসবের মাধ্যমে শুদ্ধ ও ভ্রান্ত এবং সত্য ও মিথ্যাকে পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

কর(১)। আর খাও এবং পান কর

---

(১) আয়াতে পোষাককে 'যীনাত' বা 'সাজ-সজ্জা' শব্দের মাধ্যমে এ জন্যই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সালাতে শধু গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী সাজ-সজ্জার পোষাক পরিধান করা শ্রেয়। হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সালাতের সময় উত্তম পোষাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন, তাই আমি প্রতিপালকের সামনে সুন্দর পোষাক পরে হাজির হই।' যে গুপ্ত-অঙ্গ সর্বাবস্থায় বিশেষতঃ সালাত ও তাওয়াফে আবৃত করা ফরয, তার সীমা কি? কুরআনুল কারীম সংক্ষেপে গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করার নির্দেশ দিয়ে এর বিবরণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষের গুপ্তাঙ্গ নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের গুপ্তাঙ্গ মুখমন্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল ছাড়া সমস্ত দেহ। হাদীসসমূহে এসব বিবরণ বর্ণিত রয়েছে। এ হচ্ছে গুপ্ত অঙ্গের ফরয সম্পর্কিত বিধান। এটি ছাড়া সালাতই হয় না। সালাতে শুধু গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করাই কাম্য নয়; বরং সাজ-সজ্জার পোষাক পরিধান করতেও বলা হয়েছে। যেমন সাদা পোষাক, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমাদের পোষাকাদির মধ্যে সাদা পোষাক পরিধান কর। কেননা, পোষাকাদির মধ্যে তাই উত্তম পোষাক। আর এতে তোমাদের মৃতদেরকে কাফনও দাও।' [আবু দাউদঃ ৩৮৭৮, তিরমিযীঃ ৯৯৪, ইবন মাজাহ্ঃ ১৪৭২] অনেকে সাজসজ্জার পোষাক পরাকে অহংকারী পোষাক মনে করে থাকে এটা আসলে ঠিক নয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'। এক লোক বললঃ কোন লোক পছন্দ করে তার পোষাক উত্তম হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। রাসূল বললেনঃ 'অবশ্যই আল্লাহ্ সুন্দর, সুন্দরকে ভালবাসেন। অহংকার হল, হককে না মানা, মানুষকে অবজ্ঞা করা।' [মুসলিমঃ ১৪৭] আবার অহংকার হয় এমন পোষাকও পরা যাবে না যদিও তাতে কারো কারো নিকট বাহ্যিক সুন্দর রয়েছে। যেমনঃ টাখনুর নীচে কাপড় পরা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে অহংকার বশে কাপড় টাখনুর নীচে ছেড়ে দিবে আল্লাহ্ তার দিকে তাকাবেন না।' [বুখারীঃ ৫৭৮৩] আয়াতের শানে নুযূল হিসেবে এসেছে যে, আরবের মুশরিকরা জাহেলিয়াতে মাসজিদে হারামে কা'বার তাওয়াফ করার সময় উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করত। এ ব্যাপারে তাদের দর্শন ছিল, যে কাপড় পরে গুণাহ করেছি তা দিয়ে তাওয়াফ করা যাবে না। বিশেষতঃ কুরাইশরা এ বিধি-বিধানের প্রবর্তন করে। তারাই শুধু তাওয়াফের জন্য কাপড় দিতে পারবে। এতে করে তারা কিছু বাড়তি সুবিধা আদায় করতে পারত। এমনকি মহিলারাও উলঙ্গ তাওয়াফ করত। শয়তান তাদেরকে এভাবে ইবাদাত করতে উদ্বুদ্ধ করত এবং এ কাজকে তাদের মনে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিত। আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ 'মহিলা উলঙ্গ অবস্থায় কা'বার তাওয়াফ করত আর বলত, কে আমাকে তাওয়াফের কাপড় ধার দেবে? যা তার লজ্জাস্থানে রাখবে। আরও বলতঃ

কিন্তু অপচয় কর না(১)। নিশ্চয় তিনি

আজ হয় কিছু অংশ প্রকাশ হয়ে পড়বে নয়ত পুরোটাই। আর যা আজ প্রকাশিত হবে তা আর হালাল করব না। তখন এ আয়াত নাযিল হয়- "তোমরা তোমাদের মাসজিদ তথা ইবাদাতের স্থানে সুন্দর পোষাক পরবে।' [মুসলিমঃ ৩০২৮]

(১) এ আয়াত থেকে একটি মাসআলা এরূপ বুঝা যায় যে, জগতে পানাহারের যত বস্তু রয়েছে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ বস্তুর অবৈধতা ও নিষিদ্ধতা শরী'আতের কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক বস্তুকে হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। আয়াতে ﴿وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ﴾ বলে পানাহারের অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে অপব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত إسراف শব্দের অর্থ সীমালংঘন করা। সীমালংঘন কয়েক প্রকারের হতে পারে। (এক) হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌঁছা এবং হারাম বস্তু পানাহার করতে থাকা। এ সীমালংঘন যে হারাম তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। (দুই) আল্লাহ্‌র হালালকৃত বস্তুসমূহকে শরী'আত সম্মত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করে বর্জন করা। হারাম বস্তু ব্যবহার করা যেমন অপরাধ ও গোনাহ্, তেমনি হালালকে হারাম মনে করাও আল্লাহ্‌র আইনের বিরোধিতা ও কঠোর গোনাহ্। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরয কর্ম সম্পাদনের শক্তি না থাকা- এটাও সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য। উল্লেখিত উভয় প্রকার অপব্যয় নিষিদ্ধ করার জন্য কুরআনুল কারীমের এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ "অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" [সূরা আল-ইস্‌রাঃ ২৭] অন্যত্র বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে- প্রয়োজনের চাইতে বেশী ব্যয় করে না এবং কমও করে না।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ৬৭] এ আয়াতে পানাহার সম্পর্কে যে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু পানাহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিধান ও বসবাসের প্রত্যেক কাজেই মধ্য পন্থা পছন্দনীয় ও কাম্য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'সীমালংঘন ও অহংকার না করে খাও, দান কর এবং পরিধান কর।' [নাসাঈঃ ৫/৭৯, ইবন মাজাহ্ঃ ৩৬০৫] অনুরূপভাবে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ যা ইচ্ছা পানাহার কর এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর, তবে শুধু দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাক। (এক) তাতে অপব্যয় অর্থাৎ প্রয়োজনের চাইতে বেশী না হওয়া চাই এবং (দুই) গর্ব ও অহংকার না থাকা চাই। [বুখারী] অন্যত্র এটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও বর্ণিত হয়েছে। [নাসায়ী: ২৫৫৯] তবে এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্বাভাবিক সীমা দিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ 'আদম সন্তান যে সমস্ত ভাণ্ডার পূর্ণ করে, তন্মধ্যে পেট হল সবচেয়ে খারাপ। আদম সন্তানের জন্য স্বল্প কিছু লোকমাই যথেষ্ট, যা দিয়ে সে তার পিঠ সোজা রাখতে পারে। এর বেশী করতে চাইলে এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ নিঃশ্বাসের জন্য নির্দিষ্ট করে।' [তিরমিযীঃ ২৩৮০, ইবন মাজাহঃ ৩৩৪৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১৩২]

অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না ।

চতুর্থ রুকূ‘

৩২. বলুন, ‘আল্লাহ্ নিজের বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে⁽১⁾?’ বলুন, ‘পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কেয়ামতের দিনে এ সব

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ؕ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾

﴿وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ﴾ আয়াত থেকে বেশ কয়েকটি মাসআলা জানা যায় । (এক) যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানাহার করা ফরয । (দুই) শরী‘আতের কোন দলীল দ্বারা কোন বস্তুর অবৈধতা প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত সব বস্তুই হালাল । (তিন) আল্লাহ্ তা‘আলা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহকে ব্যবহার করা অপব্যয় ও অবৈধ । (চার) যেসব বস্তু আল্লাহ্ তা‘আলা হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করাও অপব্যয় এবং মহাপাপ । (পাঁচ) পেট ভরে খাওয়ার পরও আহার করা সমীচীন নয় । (ছয়) এতটুকু কম খাওয়াও অবৈধ, যদ্দরুন দুর্বল হয়ে ফরয কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে । [দেখুন, কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

(১) কোন বস্তু হালাল অথবা হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন । এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয় । কাজেই সেসব লোক দণ্ডনীয়, যারা আল্লাহ্র হালালকৃত উৎকৃষ্ট পোষাক অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে । সংগতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণাবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও নয় । খোরাক ও পোষাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সুন্নাতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে । যেরূপ পোষাক ও খোরাক সহজলভ্য তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে হবে । আয়াতের তাফসীরে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, আরবরা জাহিলিয়াতে কাপড়-চোপড় সহ বেশ কিছু জিনিস হারাম করত । অথচ এগুলো আল্লাহ্ হারাম করেননি । যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, “বলুন, ‘তোমরা আমাকে জানাও, আল্লাহ্ তোমাদের যে রিয্ক দিয়েছেন তারপর তোমরা তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ’ বলুন, ‘আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এটার অনুমতি দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ্র উপর মিথ্যা রটনা করছ?” [সূরা ইউনুস:৫৯] তখন আল্লাহ্ তা‘আলা আলোচ্য এ আয়াত নাযিল করেন । [তাবারী] কাতাদা বলেন, ‘এ আয়াত দ্বারা জাহেলিয়াতের কাফেররা বাহীরা, সায়েবা, ওসীলা, হাম ইত্যাদি নামে যে সমস্ত প্রাণী হারাম করত সেগুলোকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে ।’ [তাবারী]

তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে(১) ।' এভাবে আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি ।

৩৩. বলুন, 'নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা(২) । আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালজ্ঘন এবং কোন কিছুকে আল্লাহ্‌র শরীক করা- যার কোন সনদ তিনি নাযিল করেননি । আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ
يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

---

(১) আয়াতের এ বাক্যে একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব নেয়ামত; উৎকৃষ্ট পোষাক ও সুস্বাদু খাদ্য প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যশীল মুমিনদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের কল্যাণেই অন্যেরা ভোগ করতে পারছে । কিন্তু আখেরাতে সমস্ত নেয়ামত ও সুখ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে । আয়াতের এ বাক্যে বলা হয়েছে, "আপনি বলে দিনঃ সব পার্থিব নেয়ামত প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনেও মুমিনদেরই প্রাপ্য এবং কেয়ামতের দিন তো এককভাবে তাদের জন্যই নির্দিষ্ট হবে ।" [তাবারী ইবন আব্বাস হতে] আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার অপর মতে এ বাক্যটির অর্থ এই যে, পার্থিব সব নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আখেরাতে শাস্তির কারণ হবে না- এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমাত্র অনুগত মুমিন বান্দাদেরই প্রাপ্য । কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এরূপ নয় । পার্থিব নেয়ামত তারাও পায় বরং আরো বেশী পায়; কিন্তু এসব নেয়ামত আখেরাতে তাদের জন্য শাস্তি ও স্থায়ী আযাবের কারণ হবে । কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নেয়ামত তাদের জন্য সম্মান ও সুখের বস্তু নয় । [কুরতুবী] কোন কোন তাফসীরবিদের মতে এর অর্থ এই যে, পার্থিব সব নেয়ামতের সাথে পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ও নানারকম দুঃখ-কষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল নেয়ামত ও অনাবিল সুখের অস্তিত্ব এখানে নেই । তবে কেয়ামতে যারা এসব নেয়ামত লাভ করবে, তারা নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবে । এগুলোর সাথে কোনরূপ পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশংকা এবং কোন চিন্তা-ভাবনা থাকবে না । [বাগভী] উপরোক্ত তিন প্রকার অর্থই আয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । তাই সাহাবী ও তাবেয়ী তাফসীরবিদগণ এসব অর্থই গ্রহণ করেছেন ।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন আর কেউ নেই; এজন্যই তিনি অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন আর আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক প্রশংসাপ্রিয় আর কেউ নেই ।' [বুখারীঃ ৫২২০]

কিছু বলা যা তোমরা জান না(১) ।’

৩৪. আর প্রত্যেক জাতির জন্য এক নির্দিষ্ট সময় আছে(২) । অতঃপর যখন তাদের সময় আসবে তখন তারা মুহূর্তকাল দেরি করতে পারবে না এবং এগিয়েও আনতে পারবে না ।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٤

৩৫. হে বনী আদম! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেন, যারা আমার আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বিবৃত করবেন, তখন যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে, তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না ।

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ
ءَايَٰتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ٣٥

৩৬. আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছে এবং তার ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে, তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ।

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَآ أُو۟لَٰٓئِكَ
أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٣٦

---

(১) আল্লাহ্‌র উপর না জেনে কথা বলার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে সাবধান করা হয়েছে । যেমনঃ সূরা আল-বাকারার ১৬৯, এবং সূরা আল-ইসরার ৩৬ নং আয়াত । আল্লাহর উপর না জেনে কথা বলা আসলেই বড় গোনাহ্‌র কাজ । আল্লাহ্‌ সম্পর্কে, গায়েব সম্পর্কে, আখেরাত সম্পর্কে, আল্লাহ্‌র দ্বীন সম্পর্কে যাবতীয় কথা যতক্ষন পর্যন্ত কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক না হবে ততক্ষন তা আল্লাহ্‌র উপর না জেনে কথা বলার আওতায় পড়বে । অনুরূপভাবে যারা না জেনে-বুঝে ফাতাওয়া দেয় তারাও আল্লাহ্‌র উপর না জেনে কথা বলেন । আর এজন্যই বলা হয়ঃ ‘ফাতাওয়া দানে যে যতবেশী তৎপর জাহান্নামে যাওয়ার জন্যও সে ততবেশী তৎপর’ ।

(২) এ সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা দুনিয়াতে ভোগ-বিলাসে থাকতে পারবে । কিন্তু এরপর যখন আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাদের পাকড়াও করতে চাইবেন তখন তাদের আর সময় দেয়া হবে না । এ ব্যাপারে বিভিন্ন সূরায় অনুরূপ আলোচনা এসেছে, যেমনঃ সূরা আল-হিজ্‌রঃ ৫ ও সূরা নূহঃ ৪, সূরা আল-মুনাফিকূনঃ ১১ ।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ
بِاٰيٰتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ ؕ
حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۙ قَالُوْٓا
اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا
ضَلُّوْا عَنَّا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا
كٰفِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রটনা করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? তাদের জন্য যে অংশ লেখা আছে তা তাদের কাছে পৌঁছবে⁽১⁾। অবশেষে যখন আমাদের ফিরিশ্‌তাগণ তাদের জান কবজের জন্য তাদের কাছে আসবে, তখন তারা জিজ্ঞেস করবে, 'আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে⁽২⁾ তারা কোথায়?' তারা বলবে, 'তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়েছে' এবং তারা নিজেদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে যে, নিশ্চয় তারা কাফের ছিল।

قَالَ ادْخُلُوْا فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ
وَالْاِنْسِ فِى النَّارِ ؕ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا ؕ
حَتّٰٓى اِذَا ادَّارَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا ۙ قَالَتْ اُخْرٰىهُمْ
لِاُوْلٰىهُمْ رَبَّنَا هٰٓؤُلَآءِ اَضَلُّوْنَا فَاٰتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا
مِّنَ النَّارِ ؕ۬ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. আল্লাহ্ বলবেন, 'তোমাদের আগে যে জিন ও মানবদল গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা আগুনে প্রবেশ কর'। যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অন্য দলকে তারা অভিসম্পাত করবে⁽৩⁾। অবশেষে যখন সবাই তাতে

---

(১) অর্থাৎ তাদের শাস্তির যে পরিমাণ লেখা আছে তা তাদের কাছে পৌঁছবেই। [তাবারী] কাতাদা বলেন, দুনিয়াতে তারা যে আমল করেছে সেটার ফলাফল আখেরাতে তাদের কাছে পৌঁছবেই। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকতে, যাদের তোমরা ইবাদত করতে এখন তারা কোথায়? তারা কি তোমাদেরকে এখন সাহায্য করতে পারে না? তারা কি তোমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না? তখন তারা স্বীকার করবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তারা আহ্বান করত, যাদের ইবাদত করত, তারা সবাই তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। এভাবে তারা তাদের নিজেদের বিপক্ষে সাক্ষী দিল যে, তারা মুশরিক ছিল, তাওহীদবাদী ছিল না। [মুয়াসসার]

(৩) অর্থাৎ যখনই কোন ধর্মাবলম্বী জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখনই সে তার ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আগে যারা প্রবেশ করেছে তাদেরকে অভিসম্পাত দিতে থাকবে। সুতরাং মুশরিকরা মুশরিকদেরকে, ইয়াহূদীরা ইয়াহূদীদেরকে, নাসারারা

একত্র হবে, তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের রব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল(১); কাজেই এদেরকে দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন।' আল্লাহ্ বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না।'

وَقَالَتْ أُولٰىهُمْ لِأُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

৩৯. আর তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে, 'আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কাজেই তোমরা যা অর্জন করেছিলে, তার জন্য শাস্তি ভোগ কর(২)।'

পঞ্চম রুকূ'

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

৪০. নিশ্চয় যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে এবং তা সম্বন্ধে অহংকার করে, তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে

নাসারাদেরকে, সাবেয়ীরা সাবেয়ীদেরকে, অগ্নিউপাসকরা অগ্নিউপাসকদেরকে লা'নত দিতে থাকবে। তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের অভিসম্পাত দিবে। [তাবারী]

(১) এ আয়াতে তাদেরকে কি কারণে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হয়েছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। সূরা আল-আহযাবের ৬৭ নং আয়াতে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা ছিল তাদের নেতা গোছের লোক। তাদের নেতৃত্বের প্রভাবেই এরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। সূরা সাবা'র ৩১ ও ৩২ নং আয়াতে এর বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি বা দল কোন ভুল চিন্তা বা কর্মনীতির ভিত্ রচনা করে সে কেবল নিজের ভুলের ও গোনাহের জন্য দায়ী হয় না বরং দুনিয়ায় যতগুলো লোক তার দ্বারা প্রভাবিত হয় তাদের সবার গোনাহের একটি অংশও তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকে। এ বিষয়টি বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে।

না[১]- যতক্ষন না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট

---

(১) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে এ আয়াতের বর্ণিত এক তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের আমল ও তাদের দো'আর জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ তাদের দো'আ কবূল করা হবে না এবং তাদের আমলকে ঐ স্থানে যেতে দেয়া হবে না, যেখানে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের আমলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। কুরআনের সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীনে এ স্থানটির নাম ইল্লি'য়্যীন বলা হয়েছে। কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতেও উল্লেখিত বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ -অর্থাৎ "মানুষের পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এবং সৎকর্ম সেগুলোকে উত্থিত করে।" [সূরা ফাতেরঃ ১০]

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে অপর এক বর্ণনা আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বর্ণিত আছে যে, কাফেরদের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন বারা' ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাযায় গমন করেন। কবর প্রস্তুতে কিছু বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান। সাহাবায়ে কেরামও তার চারদিকে চুপচাপ বসে যান। তিনি মাথা উঁচু করে বললেনঃ মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারাবিশিষ্ট ফিরিশ্‌তারা আগমন করে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির সামনে বসে যায়। অতঃপর মালাকুল মাউত আসেন এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নিশ্চিন্ত আত্মা, পালনকর্তার মাগফেরাত ও সন্তুষ্টির জন্য বের হয়ে আস। তখন তার আত্মা, এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন মশকের মুখ খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যুদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত ফিরিশ্‌তাদের কাছে সমর্পণ করে। ফিরিশ্‌তারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফিরিশ্‌তার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করেঃ এ পাক আত্মা কার? ফিরিশ্‌তারা তার ঐ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থে ব্যবহার হত এবং বলেঃ ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফিরিশ্‌তারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরো ফিরিশ্‌তা তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম আকাশে পৌঁছে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমার এ বান্দার আমলনামা ইল্লি'য়্যীনে লিখ এবং তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফিরিশ্‌তা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং প্রশ্ন করেঃ তোমার পালনকর্তা কে? তোমার দ্বীন কি ? সে বলেঃ আমার পালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা এবং দ্বীন ইসলাম। এরপর প্রশ্ন হয়ঃ এই যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন একটি আওয়াজ হয় যে, আমার বান্দা সত্যবাদী। তার জন্য জান্নাতের শয্যা পেতে দাও,

প্রবেশ করে(১) । আর এভাবেই আমরা অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেব ।

৪১. তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও; আর এভাবেই আমরা যালিমদেরকে প্রতিফল দেব ।

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۭ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

৪২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে- আমরা কারো উপর তার

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا

জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার কবরের দরজা খুলে দাও । এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি ও বাতাস আসতে থাকে । তার সৎকর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য তার কাছে এসে যায় ।

এর বিপরীতে কাফেরের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কাল রঙের ভয়ঙ্কর মূর্তি ফিরিশ্‌তা নিকৃষ্ট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায় । অতঃপর মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোন কাঁটাবিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয় । আত্মা বের হলে তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয় । ফিরিশ্‌তারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে একদল ফিরিশ্‌তার সাথে সাক্ষাৎ হয় । তারা জিজ্ঞেস করেঃ এ দুরাত্মাটি কার? ফিরিশ্‌তারা তখন তার ঐ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দ্বারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল । অর্থাৎ সে অমুকের পুত্র অমুক । অতঃপর প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বললে তার জন্য দরজা খোলা হয় না বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিজ্জীনে রেখে দাও । সেখানে অবাধ্য বান্দাদের আমলনামা রাখা হয় । এ আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে । সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে কেবল 'আঁ-আঁ-- আমি জানি না' বলে । তাকে জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোষাক দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে তার কবরের দরজা খুলে দেয়া হয় । ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌঁছাতে থাকে এবং কবরকে তার জন্য সংকীর্ণ করে দেয়া হয় । [আহমাদঃ ৪/২৮৭, ২/৩৬৪-৩৬৫, ৬/১৪০; ইবন মাজাহ্: ৪২৬২; নাসায়ী: ৪৬২]

(১) আয়াতের শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না উটের মত বিরাট পেট বিশিষ্ট জন্তু সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে । এর দ্বারা উদ্দেশ্য, সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন স্বভাবতঃ অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব । এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ।

সাধ্যের অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দেই না- তারাই জান্নাতবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ।

৪৩. আর আমরা তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করব⁽¹⁾, তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ । আর তারা বলবে, ‘যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদেরকে এ পথের হিদায়াত করেছেন । আল্লাহ্ আমাদেরকে হিদায়াত না করলে, আমরা কখনো হিদায়াত পেতাম না । অবশ্যই আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন ।’ আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, ‘তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের⁽²⁾ ওয়ারিস করা হয়েছে ।’

إِلَّا وُسْعَهَآ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ﴿٤٢﴾

وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهٰرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدٰىنَا
لِهٰذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ أَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ ۚ لَقَدْ
جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۗ وَنُوْدُوْٓا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ
أُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾

---

(১) এ আয়াতে জান্নাতীদের বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে । বলা হয়েছে, “জান্নাতীদের অন্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোন মালিন্য থাকে, তবে আমরা তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ করে দেব, তাদের নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে” । সূরা আল-হিজ্‌রের ৪৭ নং আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, “আমরা জান্নাতীদের অন্তর থেকে যাবতীয় মালিন্য দূর করে দেব, তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্টি ও ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে মুখোমুখী হয়ে খাটিয়ায় থাকবে এবং বসবাস করবে ।” অনুরূপভাবে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ‘মুমিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে । তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারো প্রতি কারো কোন কষ্ট থাকে কিংবা কারো কাছে কারো পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌঁছে পরস্পরের প্রতিদান নিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার করে নেবে । এভাবে হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে । তোমাদের প্রত্যেকেই জান্নাতে তার ঘরকে দুনিয়ায় তার ঘরের চেয়ে বেশী চিনবে ।’ [বুখারীঃ ২৪৪০]

(২) জান্নাতের বর্ণনা কুরআন ও সহীহ হাদীসে ব্যাপকভাবে এসেছে, সেখানে মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন স্পেশাল ঘোষণা থাকবে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

৪৪. আর জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, ‘আমাদের রব আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের রব তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তোমরা তা সত্য পেয়েছ কি?’ তারা বলবে, ‘হ্যাঁ।’ অতঃপর একজন ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে, ‘আল্লাহ্‌র লা‘নত যালিমদের উপর---

وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدۡ
وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقّٗا فَهَلۡ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ
رَبُّكُمۡ حَقّٗاۖ قَالُواْ نَعَمۡۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُۢ بَيۡنَهُمۡ أَن
لَّعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٤

৪৫. ‘যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত এবং সে পথে জটিলতা খুঁজে বেড়াত; এবং তারা আখেরাতকে অস্বীকারকারী ছিল।’

ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبۡغُونَهَا
عِوَجٗا وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ كَٰفِرُونَ ٤٥

৪৬. আর তাদের উভয়ের মধ্যে পর্দা থাকবে। আর আ‘রাফে(১) কিছু

وَبَيۡنَهُمَا حِجَابٞۚ وَعَلَى ٱلۡأَعۡرَافِ رِجَالٞ يَعۡرِفُونَ

বলেনঃ ‘আহ্বানকারী আহবান করে বলবেঃ তোমাদের জন্য এটাই উপযোগী যে, তোমরা সুস্থ থাকবে, কখনো তোমরা রোগাক্রান্ত হবে না। তোমাদের জন্য উপযোগী হলো জীবিত থাকা, সুতরাং তোমরা কখনো মারা যাবে না। তোমাদের জন্য উচিত হলো যুবক থাকা, সুতরাং তোমরা কখনো বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য উচিত হলো নেয়ামতের মধ্যে থাকা, সুতরাং তোমরা কখনো অভাব-অভিযোগে থাকবে না। আর এটাই হলো আল্লাহ্‌র বাণীর অর্থ যেখানে তিনি বলেছেনঃ “এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, ‘তোমরা যা করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে” ।’ [মুসলিমঃ ২৮৩৭]

(১) **আ‘রাফ কি?ঃ** সূরা হাদীদের ১২ থেকে ১৯নং আয়াতে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে। (এক) সুস্পষ্ট কাফের ও মুশরিক। (দুই) মুমিনের দল। তাদের সাথে ঈমানের আলো থাকবে। (তিন) মুনাফেকের দল। এরা দুনিয়াতে মুসলিমদের সাথে মিলে থাকত। হাশরের ময়দানেও প্রথম দিকে সাথে মিলে থাকবে এবং পুলসেরাত চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলবে। মুমিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে সামনে এগিয়ে যাবে। মুনাফেকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবেঃ একটু আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা

كُلًّا بِسِيمٰهُمْ ۚ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۣ

লোক থাকবে, যারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনবে(১)। আর তারা

উপকৃত হই। এতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন ফিরিশ্‌তা বলবেঃ পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলো তালাশ কর। এ আলো হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্মের। এ আলো হাসিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ আলো দ্বারা উপকৃত হবে না। এমতাবস্থায় মুমিন ও মুনাফেকদের মধ্যে একটি প্রাচীর বেষ্টনী দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে কেবলই আযাব দৃষ্টিগোচর হবে এবং ভেতরে মুমিনরা থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহ্‌র রহমত এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে। ইবন জারীর ও অন্যান্য তাফসীরবিদের মতে এ আয়াতে উল্লেখিত أعراف বলে ঐ প্রাচীর বেষ্টনীকেই বুঝানো হয়েছে। এ প্রাচীর বেষ্টনীর উপরিভাগের নামই আ'রাফ। কেননা, أعراف শব্দটি عرف এর বহুবচন। এর অর্থ প্রত্যেক বস্তুর উপরিভাগ। এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী প্রাচীর-বেষ্টনীর উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে এ স্থানে কিছুসংখ্যাক লোক থাকবে। তারা জান্নাত ও জাহান্নাম উভয় দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয়পক্ষের লোকদের সাথে প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা বলবে।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 'আ'রাফ উঁচু টাওয়ারের মত যা জান্নাত এবং জাহান্নামের মাঝখানে থাকবে। গোনাহ্‌গার কিছু বান্দাকে সেখানে রেখে দেয়া হবে।' কেউ কেউ বলেনঃ আ'রাফ নামকরণ এজন্য করা হয়েছে যে, এখান থেকে তারা একে অপরকে চিনতে পারবে।

আ'রাফবাসী কারাঃ বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, আ'রাফবাসী ঐ সমস্ত লোকেরা যাদের সৎ এবং অসৎকর্ম সমান হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেনঃ কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা জাহান্নাম থেকে তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার আশা পোষণ করবে। তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়। ইবন জারীর বলেন, তাদের সম্পর্কে এটা বলাই বেশী সঠিক যে, তারা হচ্ছে এমন কিছু লোক যারা জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে তাদের নিদর্শনের মাধ্যমে চিনতে পারবে। [তাবারী]

(১) এ আয়াতে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের চিহ্ন কেমন হবে তা বর্ণনা করা হয়নি। অন্য আয়াতে তাদের কিছু চিহ্ন বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "সেদিন কিছু মুখ উজ্জল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে; যাদের মুখ কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে), তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করতে।" [সূরা আলে-ইমরান: ১০৬] "আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন" [সূরা আল-মুতাফফিফীন:২৪] আরও বলেন, "সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে" [সূরা আল-কিয়ামাহ: ২২] আরও বলেন, "অনেক চেহারা সেদিন হবে উজ্জ্বল" [সূরা আবাসা:৩৮] সুতরাং চেহারা শুভ্র

لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ﴿٤٦﴾

জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'তোমাদের উপর সালাম⁽¹⁾ ।' তারা তখনো জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু আকাংখা করে ।

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحٰبِ النَّارِ ۙ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর যখন তাদের দৃষ্টি অগ্নিবাসীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না⁽²⁾ ।'

ষষ্ঠ রুকূ'

وَنَادٰٓى أَصْحٰبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ

৪৮. আর আ'রাফবাসীরা এমন লোকদেরকে ডাকবে, যাদেরকে তারা তাদের চিহ্ন

ও সুন্দর হওয়া জান্নাতীদের চিহ্ন । আর চেহারা কালো, বিকট ও নীলচক্ষুবিশিষ্ট হওয়া জাহান্নামীদের চিহ্ন । আল্লাহ্ বলেন, "তাদের মুখমন্ডল যেন রাতের অন্ধকারের আস্তরণে আচ্ছাদিত । তারাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ।" [সূরা ইউনুস: ২৭] আরও বলেন, "আর অনেক চেহারা সেদিন হবে ধূলিধূসর" [সূরা আবাসা: ৪০] আরও বলেন, "যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং যেদিন আমরা অপরাধীদেরকে নীলচক্ষু তথা দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব ।" [সূরা ত্বা-হা: ১০২] আর এ জন্যই ইবন আব্বাস বলেন, জাহান্নামীদের চেনা যাবে তাদের কালো চেহারায়; আর জান্নাতীদের চেনা যাবে তাদের চেহারার শুভ্রতায় । [তাবারী]

(১) আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবেঃ 'সালামুন 'আলাইকুম' । এ বাক্যটি দুনিয়াতেও পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সম্মান প্রদর্শনার্থে বলা হয় এবং বলা সুন্নাত । মৃত্যুর পর কবর যিয়ারতের সময় এবং হাশর ও কেয়ামতেও বলা হবে । অনুরূপভাবে ফিরিশ্তাগণও জান্নাতীদেরকে এ বাক্য দ্বারা সালাম করবে । [সূরা আর্-রা'আদঃ ২৪, সূরা আয্-যুমারঃ ৭৩] [তাবারী] কিন্তু আয়াত ও হাদীসদৃষ্টে জানা যায় যে, দুনিয়াতে 'আস্সালামু 'আলাইকুম' বলা সুন্নাত ।

(২) অর্থাৎ আ'রাফবাসীরা সবাইকে চিনবে, তারপর যখন জান্নাতীদেরকে তাদের পাশ দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা তাদেরকে 'সালামুন আলাইকুম' বলবে । যদিও জান্নাতে প্রবেশ করেনি তবুও তারা আশায় থাকবে । পক্ষান্তরে জাহান্নামীদেরকে যখন তাদের পাশ দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হবে এবং বলতে থাকবে, হে আমাদের রব আমাদেরকে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না । [তাবারী]

بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾

দ্বারা চিনবে, তারা বলবে, ‘তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না ।’

أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. এরাই কি তারা(১), যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে রহমতে শামিল করবেন না? (এদেরকেই বলা হবে,) ‘তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না ।’

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا
عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ
حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

৫০. আর জাহান্নামীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, ‘আমাদের উপর ঢেলে দাও কিছু পানি, অথবা তা থেকে যা আল্লাহ্ জীবিকারূপে তোমাদেরকে দিয়েছেন ।’ তারা বলবে, ‘আল্লাহ্ তো এ দুটি হারাম করেছেন কাফেরদের জন্য ।

---

(১) জান্নাতের ঈমানদার লোকদের দিকে ইঙ্গিত করে আ'রাফবাসীরা কাফেরদেরকে বলবে, তোমরা দুনিয়াতে ঈমানদারদের ব্যাপারে উপহাস করতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি কোন প্রকার দয়া করবেন না । অথচ এখন তারাই জান্নাতে রয়েছে, তাদেরকে ভয়-ভীতি ও পেরেশানী ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে । আর তোমাদের অহংকার তোমাদের কোন কাজে আসে নি [মুয়াসসার] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আরাফবাসী হচ্ছে এমন কিছু লোক, যাদের অনেক বড় বড় গুনাহ রয়েছে । তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয়েছে । তাদেরকে দেয়ালের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে । সুতরাং তারা যখন জান্নাতীদের দিকে তাকাবে তখন তারা জান্নাতের আশা করবে, আর যখন জাহান্নামীদের দিকে তাকাবে তখন তারা জাহান্নাম থেকে নিস্কৃতি কামনা করবে । অতঃপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করা হবে । আর তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন যে, হে জাহান্নামবাসী, তোমরা কি এ আরাফবাসীদের নিয়েই বলতে যে, আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর রহমতে প্রবেশ করাবেন না? হে ‘আরাফবাসী! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর তোমাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই । [তাবারী]

৫১. ‘যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছিল। আর দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল।’ কাজেই আজ আমরা তাদেরকে (জাহান্নামে) ছেড়ে রাখব, যেমনিভাবে তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাতের জন্য কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিল(১), আর (যেমন) তারা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল।

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

৫২. আর অবশ্যই আমরা তাদের নিকট নিয়ে এসেছি এমন এক কিতাব, যা আমরা জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশদ ব্যাখ্যা করেছি(২)। আর যা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমতস্বরূপ।

وَلَقَدْ جِئْنَٰهُم بِكِتَٰبٍ فَصَّلْنَٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. তারা কি শুধু সে পরিণামের অপেক্ষা করে? যেদিন সে পরিণাম প্রকাশ পাবে, সেদিন যারা আগে সেটার

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ ۚ يَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ

---

(১) আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি আমাদের রবকে কেয়ামতের দিন দেখতে পাব? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র দীদার সংক্রান্ত কথা উল্লেখ করে বললেনঃ ‘তারপর আল্লাহ্ তাঁর কোন এক বান্দার সাথে সাক্ষাত করে বলবেন, হে অমুক! তোমাকে কি আমি সম্মানিত করিনি? নেতৃত্ব দেইনি? বিয়ে করাইনি? তোমার জন্য ঘোড়া ও উট আয়ত্বাধীন করে দেইনি? তোমাকে কি প্রধান এবং শুল্ক আদায়কারী বানাইনি? (তোমাকে এমন আরামে রেখেছি যে, তোমার কোন কষ্ট অনুভূত হয়নি।) সে বলবেঃ হ্যাঁ। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ তুমি কি আমার সাক্ষাতে বিশ্বাসী ছিলে? সে বলবেঃ না। তখন আল্লাহ্ বলবেনঃ আজ আমি তোমাকে ছেড়ে দেব যেমন তুমি আমাকে ছেড়েছিলে। [মুসলিমঃ ২৯৬৮]

(২) আল্লাহ্ তা‘আলা এখানে কাফের-মুশরিকদের ওজর আপত্তি তোলার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের জন্য রাসূলের মাধ্যমে কিতাব দিয়েছেন, যে কিতাবে সবকিছু স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য আয়াতেও এ বিস্তারিত আলোচনার কথা আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। [ইবন কাসীর]

رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٥٣﴾ ع

কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে, ‘আমাদের রবের রাসূলগণ তো সত্যবাণী এনেছিলেন, আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে অথবা আমাদেরকে কি আবার ফেরত পাঠানো হবে-- যেন আমরা আগে যা করতাম তা থেকে ভিন্ন কিছু করতে পারি?’ অবশ্যই তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রটনা করত, তা তাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে।

সপ্তম রুকূ‘

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

৫৪. নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয়⁽¹⁾ দিনে⁽²⁾

---

(১) এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ছয় দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে সূরা ফুস্‌সিলাতের নবম ও দশম আয়াতে বলা হয়েছে যে, দু'দিনে ভুমণ্ডল, দু'দিনে ভূমণ্ডলের পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের পানাহারের বস্তু-সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হল। বলা হয়েছেঃ ﴿خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ﴾ আবার বলা হয়েছেঃ ﴿وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ﴾ যে দু'দিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। দ্বিতীয় দু'দিন ছিল মঙ্গল ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের সাজ-সরঞ্জাম পাহাড়, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছেঃ ﴿فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ﴾ -অর্থাৎ “অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দু'দিনে।” [সূরা ফুস্‌সিলাতঃ ১২] বাহ্যতঃ এ দু'দিন হবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার; অর্থাৎ এ পর্যন্ত ছয় দিন হল। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) জানা কথা যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র-সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হল? কোন কোন তাফসীরবিদ বলেছেনঃ ছয় দিন বলে জাগতিক ৬ দিন বুঝানো হয়েছে। কিন্তু পরিস্কার ও নির্মল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে দিবা-রাত্রির পরিচয়ের অন্য কোন লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে; যেমন জান্নাতের দিবা-রাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবেনা। সহীহ্ বর্ণনা

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ
النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ
مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ
رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

সৃষ্টি করেছেন(১); তারপর তিনি 'আরশের উপর উঠেছেন(২)। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি,

---

অনুযায়ী যে ছয় দিনে জগত সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবার শেষ হয়।

(১) এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বকে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কুরআনুল কারীমেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথা বার বার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছেঃ "এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়।" [সূরা আল-কামারঃ ৫০] আবার কোথাও বলা হয়েছেঃ "আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেনঃ হয়ে যাও। আর সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়"। [যেমন, সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১১৭] এমতাবস্থায় বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগার কারণ কি? তাফসীরবিদ সায়ীদ ইবন জুবাইর রাহিমাহুল্লাহ্ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনার ধারাবাহিকতা ও কর্মতৎপরতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে।

(২) আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপর উঠেছেন এটা সহীহ্ আকীদা। কিন্তু তিনি কিভাবে উঠেছেন, কুরআন-সুন্নায় এ ব্যাপারে কোন বক্তব্য নাই বিধায় তা আমরা জানি না। এ বিষয়ে সূরা আল-বাকারার ২৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ্কে কেউ استواء সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেনঃ استواء শব্দের অর্থ তো জানাই আছে; কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা মানব বুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এর অবস্থা ও স্বরূপ জিজ্ঞেস করা বিদ'আত। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরনের প্রশ্ন কখনো করেননি। কারণ, তারা এর অর্থ বুঝতেন। শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা এ গুণে কিভাবে গুণান্বিত হলেন, তা শুধু মানুষের অজানা। এটি আল্লাহ্র একটি গুণ। আল্লাহ্ তা'আলা যে রকম, তাঁর গুণও সে রকম। সুফিয়ান সওরী, ইমাম আওযা'য়ী, লাইস ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে 'উয়াইনা, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক রাহিমাহুমুল্লাহ্ প্রমুখ বলেছেনঃ যেসব আয়াত আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এগুলো হক এবং এগুলোর অর্থও স্পষ্ট। তবে গুণান্বিত হওয়ার ধরণের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করা যাবে না। বরং যেভাবে আছে সেভাবে রেখে কোনরূপ অপব্যাখ্যা ও সাদৃশ্য ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। [এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, ইমাম যাহাবী রচিত আল-উলু]

যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন(১)। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই(২)। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্ কত বরকতময়!

৫৫. তোমরা বিনিতভাবে ও গোপনে(৩)

ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বিশ্বকে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। দিবা-রাত্রির এ বিরাট পরিবর্তন আল্লাহ্র কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায় -মোটেই দেরী হয় না। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী। এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে। কারণ, এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্র আদেশে চলছে। এ চলার গতিতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও অসম্ভব। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিজেই যখন নির্দিষ্ট সময়ে এগুলোকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই তছনছ হয়ে যাবে। আর তখনই হবে কেয়ামত।

(২) الخلق শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা এবং الأمر শব্দের অর্থ আদেশ করা। বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট। যেমনিভাবে তিনিই উপর-নীচের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তেমনিভাবে নির্দেশ দানের অধিকারও তাঁর। এ নির্দেশ দুনিয়ায় তাঁর শরী'আত সম্বলিত নির্দেশকে বোঝানো হবে। আর আখেরাতে ফয়সালা ও প্রতিদান-প্রতিফল দেয়াকে বোঝানো হবে। [সা'দী]

(৩) এখানে দো'আর কতিপয় আদব শেখানো হচ্ছে। বলা হয়েছেঃ ﴿تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ এর মধ্যে تضرع শব্দের অর্থ অক্ষমতা, বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা এবং خفية শব্দের অর্থ গোপন। এ শব্দদ্বয়ে দো'আর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ অপারগতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা; যা দো'আর প্রাণ। আল্লাহ্র কাছে এর মাধ্যমে নিজের অভাব-অনটন ব্যক্ত করা। দ্বিতীয়তঃ চুপিচুপি ও সংগোপনে দো'আ করা; যা উত্তম এবং কবূলের নিকটবর্তী। কারণ, উচ্চস্বরে দো'আ চাওয়ার মধ্যে প্রথমতঃ বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ এতে রিয়া এবং সুখ্যাতিরও আশংকা রয়েছে। তৃতীয়তঃ এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই কথা জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও নীরব সব কথাই তিনি শোনেন। এ কারণেই খাইবার যুদ্ধের সময় দো'আ করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'তোমরা কোন বধিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি করছ না যে, এত জোরে বলতে হবে; বরং একজন শ্রোতা ও নিকটবর্তীকে সম্বোধন করছ।' [বুখারীঃ ৬৬১০, মুসলিমঃ ২৭০৪] অনুরূপভাবে,

তোমাদের রবকে ডাক(১); নিশ্চয় তিনি

الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

আল্লাহ্ তা'আলা জনৈক নবীর দো'আ উল্লেখ করে বলেনঃ ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ﴾ -অর্থাৎ “যখন সে তার পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকলেন।” [সূরা মার্‌ইয়ামঃ ৩] এতে বুঝা গেল যে, অনুচ্চস্বরে দো'আ করা আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দ।

পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ অধিকাংশ সময় আল্লাহ্‌র স্মরণে ও দো'আয় মশগুল থাকতেন, কিন্তু কেউ তাদের আওয়াজ শুনতে পেত না। বরং তাদের দো'আ তাদের ও আল্লাহ্‌র মধ্যে সীমিত থাকত। তাদের অনেকেই সমগ্র কুরআন মুখস্থ তিলাওয়াত করতেন; কিন্তু অন্য কেউ টেরও পেত না। অনেকেই প্রভূত দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতেন; কিন্তু মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে বেড়াতেন না। অনেকেই রাতের বেলায় স্বগৃহে দীর্ঘ সময় সালাত আদায় করতেন; কিন্তু আগন্তুকরা তা বুঝতেই পারত না। হাসান বসরী আরো বলেনঃ আমি এমন অনেককে দেখেছি, যারা গোপনে সম্পাদন করার মত কোন ইবাদাত কখনো প্রকাশ্যে করেন নি। দো'আয় তাদের আওয়াজ অত্যন্ত অনুচ্চ হত। ইবন জুরাইজ বলেনঃ দো'আয় আওয়াজকে উচ্চ করা এবং শোরগোল করা মাকরূহ। [ইবন কাসীর] আবু বকর জাস্‌সাস বলেনঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, নীরবে দো'আ করা জোরে দো'আ করার চাইতে উত্তম। এমনকি আয়াতে যদি দো'আর অর্থ যিক্‌র ও ইবাদাত নেয়া হয়, তবে এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী মনীষীদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, নীরবে যিক্‌র সরব যিক্‌র অপেক্ষা উত্তম। [আহকামুল কুরআন]

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও সময়ে সরব যিক্‌রই কাম্য ও উত্তম। উদাহরণতঃ আযান ও একামত উচ্চঃস্বরে বলা, সরব সালাতসমূহে উচ্চঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা, সালাতের তাকবীর, আইয়ামে তাশরীকের তাকবীর এবং হজে পুরুষদের জন্য লাব্বাইকা উচ্চঃস্বরে বলা ইত্যাদি। এ কারণেই এ সম্পর্কে আলেমগণের সিদ্ধান্ত এই যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব বিশেষ অবস্থা ও স্থানে কথা ও কর্মের মাধ্যমে সরব যিক্‌র করার শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে সজোরেই করা উচিত। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও স্থানে নীরব যিক্‌রই উত্তম ও অধিক উপকারী।

(১) এ আয়াতে এদিকে দৃষ্টিপাত করা হচ্ছে যে, একমাত্র আল্লাহ্ই যখন অসীম শক্তির অধিকারী এবং যাবতীয় অনুকম্পা ও নেয়ামত প্রদানকারী, তখন বিপদাপদ ও অভাব-অনটনে তাঁকেই ডাকা এবং তাঁর কাছেই দো'আ-প্রার্থনা করা উচিত। তাঁকে ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মূর্খতা ও বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর। আরবী ভাষায় দো'আর দু'টি অর্থ হয়- (এক) বিপদাপদ দূরীকরণ ও অভাব পূরণের জন্য কাউকে ডাকা; যাকে দো'আয়ে-মাসআলা বলে। (দুই) যে কোন অবস্থায় ইবাদাতের মাধ্যমে কাউকে স্মরণ করা; যাকে দো'আয়ে-ইবাদাত বলে। আয়াতে দো'আ দ্বারা উভয় অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অভাব পূরণের জন্য স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক অথবা স্মরণ কর এবং পালনকর্তার ইবাদাত কর। প্রথম অবস্থায় অর্থ হবে স্বীয় অভাব-অনটনের

সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না⁽¹⁾ ।

৫৬. আর যমীনে শান্তি স্থাপনের পর তোমরা সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না⁽²⁾ । আর আল্লাহকে ভয় ও আশার

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ
خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

সমাধান একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই প্রার্থনা কর । আর দ্বিতীয় অবস্থার অর্থ হবে, স্মরণ ও ইবাদাত একমাত্র তাঁরই কর । [সা'দী] উভয় তাফসীরই পূর্ববর্তী মনীষী ও তাফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত হয়েছে ।

(১) مُعْتَدِيْنَ শব্দটি اِعْتِدَاء থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা । উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না । তা দো'আয় সীমা অতিক্রম করাই হোক কিংবা অন্য কোন কাজে- কোনটিই আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় নয় । চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সীমা ও শর্তাবলী পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম । সালাত, সিয়াম, হজ, যাকাত ও অন্যান্য লেনদেনে শরী'আতের সীমা অতিক্রম করলে সেগুলো ইবাদাতের পরিবর্তে গোনাহে রূপান্তারিত হয়ে যায় ।

দো'আয় সীমা অতিক্রম করা কয়েক প্রকারে হতে পারে । (এক) দো'আয় শাব্দিক লৌকিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা । এতে বিনয় ও নম্রতা ব্যাহত হয় । (দুই) দো'আয় অনাবশ্যক শর্ত সংযুক্ত করা । যেমন, বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্‌ফাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু স্বীয় পুত্রকে এভাবে দো'আ করতে দেখলেনঃ 'হে আল্লাহ্, আমি আপনার কাছে জান্নাতে শুভ্র রঙ্গের ডান দিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি । তিনি পুত্রকে বারণ করে বললেনঃ বৎস, তুমি আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাত চাও এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাও । কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এমন কিছু লোক হবে যারা দো'আ এবং পবিত্রতার মধ্যে সীমাতিক্রম করবে ।' [আবু দাউদঃ ৯৬, ইবন মাজাহ্ঃ ৩৮৬৪, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৮৭, ৫/৫৫] (তিন) সাধারণ মুসলিমদের জন্য বদ দো'আ করা কিংবা এমন কোন বিষয় কামনা করা যা সাধারণ লোকের জন্য ক্ষতিকর এবং অনুরূপ এখানে উল্লেখিত দো'আয় বিনা প্রয়োজনে আওয়াজ উচ্চ করাও এক প্রকার সীমা অতিক্রম । (চার) এমন অসম্ভব বিষয় কামনা করা যা হবার নয় । যেমন, নবীদের মর্যাদা বা নবুওয়ত চাওয়া ।

(২) এখানে صلاح ও فساد শব্দ দু'টি পরস্পর বিরোধী । صلاح শব্দের অর্থ সংস্কার আর إصلاح শব্দের অর্থ সংস্কার করা এবং فساد শব্দের অর্থ অনর্থ ও গোলযোগ আর إفساد শব্দের অর্থ অনর্থ সৃষ্টি করা । মূলতঃ সমতা থেকে বের হয়ে যাওয়াকে 'ফাসাদ' বলা হয়; তা সামান্য হোক কিংবা বেশী । কম বের হলে কম ফাসাদ এবং বেশী বের হলে বেশী ফাসাদ হবে । কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি

الْمُحْسِنِينَ ٥٦

সাথে ডাক(১) । নিশ্চয় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ

করো না, আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সংস্কার করার পর ।

আল্লাহ্ তা'আলার সংস্কার কয়েক প্রকার হতে পারে । (এক) প্রথমেই জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি করা । যেমন, সূরা মুহাম্মাদের ২নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ (দুই) অনর্থ আসার পর তা দূর করা । যেমন, সূরা আল-আহ্‌যাবের ৭১নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ (তিন) সংস্কারের নির্দেশ দান করা । যেমন, এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ “যখন আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন, তখন তোমরা তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না ।” এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার দু'টি অর্থ হতে পারে । (এক) বাহ্যিক সংস্কার; অর্থাৎ পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বৃক্ষ রোপনের উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ করে মাটি থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্য মাটি থেকে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন । (দুই) পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন । নবী-রাসূল, গ্রন্থ ও হেদায়াত প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শির্ক, পাপাচার ইত্যাদি থেকে পবিত্র করেছেন । সৎ আমল দিয়ে পূর্ণ করেছেন । আয়াতে উভয় অর্থ, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কারও উদ্দিষ্ট হতে পারে । অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন । এখন তোমরা এতে গোনাহ্ ও অবাধ্যতার মাধ্যমে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করো না । [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় ও আশা সহকারে ডাক । একদিকে দো'আ অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তাঁর করুণা লাভের পূর্ণ আশাও থাকবে । এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে মানবাত্মার দু'টি বাহু । এ বাহুদ্বয়ের সাহায্যে সে ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ পদ মর্যাদা অর্জন করে । এ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও ভয় সমান সমান হওয়া উচিত । কোন কোন আলেম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন, যাতে আনুগত্যে ক্রটি না হয়, আর যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে । কেননা, এখন কাজ করার শক্তি বিদায় নিয়েছে । করুণা লাভের আশা করাই এখন তার একমাত্র কাজ । [কুরতুবী] মোটকথা, দো'আর দু'টি আদব হল- বিনয় ও নম্রতা এবং আস্তে ও সংগোপনে দো'আ করা । এ দু'টি গুণই মানুষের বাহ্যিক দেহের সাথে সম্পৃক্ত । কেননা, বিনয়ের অর্থ হল দো'আর সময় দৈহিক আকার-আকৃতিকে অপারগ ও ফকীরের মত করে নেয়া, অহংকারী ও বেপরোয়ার মত না হওয়া । দো'আ সংগোপনে করার সম্পর্কও জিহ্বার সাথে যুক্ত । এ আয়াতে দো'আর আরো দু'টি আভ্যন্তরীণ আদব বর্ণিত হয়েছে । এগুলোর সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে । আর তা হল এই যে, দো'আকারীর মনে এ ভয় ও আশংকা থাকা উচিত যে, সম্ভবতঃ দো'আটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ আশাও থাকা উচিত যে, দো'আ কবূল হতে পারে । তবে দো'আকারীর মনে এটা প্রবল

মুহসিনদের খুব নিকটে⁽¹⁾।

৫৭. আর তিনিই সে সত্তা; যিনি তাঁর রহমত বৃষ্টির আগে বায়ূ প্রবাহিত করেন সুসংবাদ হিসেবে⁽²⁾,

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ
رَحْمَتِهٖ ۭ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ

থাকতে হবে যে, তার দো'আ কবূল হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'তোমরা আল্লাহ্কে এমনভাবে ডাকবে যে, তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তিনি তা কবূল করবেন।' [তিরমিযীঃ ৩৪৭৯, হাকেমঃ ১/৪৯৩, মুসনাদে আহমাদঃ ২/১৭৭]

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার করুণা সৎকর্মীদের নিকটবর্তী। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও দো'আর সময় ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার দিকটিই থাকবে প্রবল। কেননা, বিশ্ব প্রতিপালক পরম দয়ালু আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহে কোন ত্রুটি ও কৃপণতা নেই। তিনি মন্দ লোকের দো'আও কবূল করতে পারেন। কবূল না হওয়ার আশংকা স্বীয় কুকর্ম ও গোনাহ্র অকল্যাণেই থাকতে পারে। কারণ, আল্লাহ্র রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য সৎকর্মী হওয়া প্রয়োজন। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে, স্বীয় বেশভূষা ফকীরের মত করে এবং আল্লাহ্র সামনে দো'আর হস্ত প্রসারিত করে; কিন্তু তার খাদ্য, পানীয় ও পোষাক সবই হারাম- এরূপ লোকের দো'আ কিরূপে কবূল হতে পারে?' [মুসলিমঃ ১০১৫] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ 'বান্দা যতক্ষণ কোন গোনাহ্ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দো'আ না করে এবং তড়িঘড়ি না করে, ততক্ষণ তার দো'আ কবূল হতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ তড়িঘড়ি দো'আ করার অর্থ কি? তিনি বলেনঃ এর অর্থ হল এরূপ ধারণা করে বসা যে, আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দো'আ করছি, অথচ এখনো পর্যন্ত কবূল হল না। অতঃপর নিরাশ হয়ে দো'আ ত্যাগ করা। [মুসলিমঃ ২৭৩৫] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যখনই আল্লাহ্র কাছে দো'আ করবে তখনই কবূল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দো'আ করবে' ।[মুসনাদ আহমাদঃ ২/১৭৭, তিরমিযীঃ ৩৪৭৯] অর্থাৎ আল্লাহ্র রহমতের ভাণ্ডারের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দো'আ করলে অবশ্যই দো'আ কবুল হবে বলে মনকে মজবুত কর। এমন মনে করা, গোনাহ্র কারণে দো'আ কবুল না হওয়ার আশংকা অনুভব করা এর পরিপন্থী নয়।

(২) এতে رياح শব্দটি ريح শব্দের বহুবচন। এর অর্থ বায়ূ। আর بُشراً শব্দের অর্থ সুসংবাদ। এবং রহমত বলে বৃষ্টির রহমত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদ দেয়ার জন্য বায়ূ প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির পূর্বে ঠাণ্ডা বায়ূ প্রেরণ করা আল্লাহ্র চিরন্তন রীতি। এ বাতাস দ্বারা স্বয়ং মানুষ আরাম ও প্রফুল্লতা অর্জন করে এবং তা যেন ভাবী বৃষ্টির সংবাদও পূর্বাহ্নে প্রদান করে।

لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ
مِن كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۚ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

অবশেষে যখন সেটা ভারী মেঘমালা বয়ে আনে(১) তখন আমরা সেটাকে মৃত জনপদের দিকে চালিয়ে দেই, অতঃপর আমরা তার দ্বারা বৃষ্টি বর্ষণ করি(২), তারপর তা দিয়ে সব রকমের ফল উৎপাদন করি। এভাবেই আমরা মৃতদেরকে বের করব, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর(৩)।

---

(১) سحاب শব্দের অর্থঃ মেঘ, এবং ثقال শব্দটি ثقيل এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী। অর্থাৎ বায়ূ যখন ভারী মেঘমালাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। ভারী মেঘমালার অর্থ, পানিতে ভরপুর মেঘমালা- যা বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে উপরে উঠে যায়। এভাবে হাজারো মণ ভারী পানি বাতাসে ভর করে উপরে পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হওয়া মাত্র আপনা-আপনি সমুদ্র থেকে বাস্প (মৌসুমী বায়ূ) উত্থিত হতে থাকে এবং উপরে উঠে মেঘমালার আকার ধারণ করে।

(২) অর্থাৎ বাতাস যখন ভারী মেঘমালাকে তুলে নেয়, তখন আমি মেঘমালাকে কোন মৃত শহরের দিকে পরিচালিত করি। মৃত শহর বলে এমন জনপদকে বুঝানো হয়েছে, যা পানির অভাবে উজাড়প্রায়। [মানার; আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

এ পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিষয়-বস্তুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রমাণিত হল। প্রথমতঃ বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়। এতে বুঝা গেল যে, যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও 'সামা' (আকাশ) শব্দ দ্বারা মেঘমালাকেই বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কোন বিশেষ দিক কিংবা বিশেষ ভূখণ্ডের দিকে মেঘমালা ধাবিত হওয়া সরাসরি আল্লাহ্‌র নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দান করেন। মেঘমালা আল্লাহ্‌র সে নির্দেশই পালন করে মাত্র।

এ বিষয়টি সর্বত্রই এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মাঝে মাঝে কোন শহর অথবা জনপদের উপর মেঘমালা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে এবং সেখানে বৃষ্টির প্রয়োজনও থাকে, কিন্তু মেঘমালা সেখানে এক ফোঁটা পানিও দেয় না; বরং আল্লাহ্‌র নির্দেশে যে শহর বা জনপদের প্রাপ্য নির্ধারিত থাকে, সেখানে পৌঁছেই বর্ষিত হয়। নির্দিষ্ট শহর ছাড়া অন্যত্র মেঘের পানি লাভ করার সাধ্য কারো নেই।

(৩) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলছেনঃ আমি মৃত শহরে পানি বর্ষণ করি, তারপর পানি দ্বারা সব রকম ফল-মূল উৎপন্ন করি। এভাবেই আমি মৃতদেরকে কেয়ামতের দিন উত্থিত করব যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আমি যেভাবে মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত

৫৮. আর উৎকৃষ্ট ভূমি-তার ফসল তার রবের আদেশে উৎপন্ন হয়। আর যা নিকৃষ্ট, তাতে কঠোর পরিশ্রম না করলে কিছুই জন্মে না(১)। এভাবে আমরা

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

করি এবং তা থেকে বৃক্ষ ও ফল-মূল নির্গত করি, তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে তুলব। আমি এসব দৃষ্টান্ত এজন্য বর্ণনা করি, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাও এবং ঈমান আন [জালালাইন]। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেয়ামতে দু'বার শিঙ্গা ফুঁকা হবে। প্রথম ফুঁৎকারের পর সারা বিশ্ব ধ্বংসস্তুপে পরিণত হবে, কোনকিছুই জীবিত থাকবে না। দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পর নতুনভাবে সারা বিশ্ব সৃজিত হবে এবং সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, উভয়বার শিঙ্গায় ফুঁৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। এ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে থাকবে। এ সময়ের মধ্যেই প্রতিটি মৃত মানুষ ও জন্তুর দেহের অংশ একত্রিত করে পূর্ণ কাঠামো তৈরী করা হবে। অতঃপর শিঙ্গা ফুঁকার সাথে সাথে এসব মৃতদেহে আত্মা এসে যাবে এবং জীবিত হয়ে দণ্ডায়মান হবে। [দেখুন,মুসলিমঃ ২৯৫৫]

(১) অর্থাৎ বৃষ্টির কল্যাণধারা যদিও প্রত্যেক শহর ও ভূখণ্ডে সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়ে ভূখণ্ড দু' প্রকার হয়ে থাকে। (এক) উর্বর ও ভাল- যাতে উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এ ধরণের ভূখণ্ড থেকে সর্বপ্রকার ফল-মূল উৎপন্ন হয়। (দুই) শক্ত ও লবনাক্ত ভূখণ্ড। এতে উৎপাদনের যোগ্যতা নেই। এরূপ ভূখণ্ডে হয়তো কিছুই উৎপন্ন হয় না, আর কিছু হলেও খুব অল্প পরিমাণে হয়। তাও অকেজো ও নষ্ট হয়ে থাকে। [তাবারী, বাগভী, ইবন কাসীর, সা'দী, জালালাইন] এর উদাহরণ দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ্ আমাকে যে হেদায়াত ও ইলম নিয়ে পাঠিয়েছেন তার উদাহরণ হল এমন মুষল বৃষ্টির মত যা কোন যমীনের উপর গিয়ে পড়ল। কিন্তু সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর যমীন ছিল। তন্মধ্যে কিছু ভাল জমি ছিল যা পানি গ্রহণ করল ফলে তাতে ফসল ও প্রচুর ঘাস জন্মালো, আবার তন্মধ্যে এমন কিছু নিম্ন যমীনও ছিল যা পানি আটকে রাখতে সক্ষম হয়েছিল, ফলে আল্লাহ্ তার দ্বারা মানুষের উপকার করলেন। তারা তা পান করল এবং ফসল সিক্ত করল, ক্ষেত খামার করল। আবার তন্মধ্যে এমন কিছু যমীনও ছিল যা শক্ত ভূমি যা পানিও ধারণ করতে পারল না, কিছু উৎপন্নও করতে পারল না। ঠিক এটাই হল ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দ্বীনের ফিকহ তথা সুক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করেছে আর আল্লাহ্ আমাকে যা নিয়ে পাঠিয়েছে তা তার উপকারে আসল, সে সেটা নিজে জানল অপরকে জানাল। আর ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে এর প্রতি মাথা উঠিয়ে তাকাল না, আর আমি যে হেদায়াত নিয়ে এসেছি তা কবুল করল না। [বুখারীঃ ৭৯, মুসলিমঃ ২২৮২]

কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃত করি(১)।

অষ্টম রুকূ‘

৫৯. অবশ্যই আমরা নূহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে। অতঃপর তিনি বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর মহাদিনের শাস্তির আশংকা করছি।’

لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوۡمِ
ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۖ إِنِّيٓ أَخَافُ
عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥٩

৬০. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলেছিল, ‘আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত দেখছি।’

قَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوۡمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَٰلٖ
مُّبِينٖ ٦٠

৬১. তিনি বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন ভ্রষ্টতা নেই, বরং আমি তো সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে রাসূল।’

قَالَ يَٰقَوۡمِ لَيۡسَ بِي ضَلَٰلَةٞ وَلَٰكِنِّي رَسُولٞ مِّن
رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦١

৬২. ‘আমি আমার রবের রিসালাত (যা নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা) তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি। আর তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে জানি।’

أُبَلِّغُكُمۡ رِسَٰلَٰتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمۡ وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ
مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٦٢

৬৩. তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে

أَوَعَجِبۡتُمۡ أَن جَآءَكُمۡ ذِكۡرٞ مِّن رَّبِّكُمۡ عَلَىٰ رَجُلٖ

---

(১) বৃষ্টির কল্যাণধারার মত আল্লাহ্‌র হেদায়াত ও নির্দেশাবলীর কল্যাণও সব মানুষের জন্য ব্যাপক; কিন্তু প্রতিটি ভূখণ্ডই যেমন বৃষ্টি থেকে উপকার লাভ করে না, তেমনি প্রতিটি মানুষও এ হেদায়াত থেকে ফায়দা হাসিল করে না; বরং একমাত্র তারাই ফায়দা হাসিল করে, যারা কৃতজ্ঞ ও এর মর্যাদা দিয়ে থাকে। [সা‘দী]

مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝٦٣

তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ⁽১⁾ এসেছে, যাতে তিনি তোমাদেরকে সতর্ক করেন এবং যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। আর যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও ?'

فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ۝٦٤

৬৪. অতঃপর তারা তার উপর মিথ্যারোপ করল। ফলে তাকে ও তার সাথে যারা নৌকায় ছিল আমরা তাদেরকে উদ্ধার করি এবং যারা আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দেই। তারা তো ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়⁽২⁾।

---

(১) মূলে ذكر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদেরই একজন লোক, যার বংশ ও সত্যবাদিতা তোমাদের কাছে স্বীকৃত। তার কাছে এমন কিছু এসেছে যা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবে, যাতে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে। [মুয়াসসার]

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের উম্মতের অবস্থা ও তাদের সংলাপের বিবরণ রয়েছে। আদম 'আলাইহিস্ সালাম যদিও সর্বপ্রথম নবী, কিন্তু তার আমলে ঈমানের সাথে কুফর ও গোমরাহীর দ্বন্দ ছিল না। কুফর ও কাফেরদের কোথাও অস্তিত্ব ছিল না। কুফর ও শির্কের সাথে ঈমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের আমল থেকেই শুরু হয়। রিসালাত ও শরী'আতের দিক দিয়ে তিনিই জগতের প্রথম রাসূল। এছাড়া তুফানে সমগ্র বিশ্ব নিমজ্জিত হওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচে ছিল, তারা ছিল নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম ও তার নৌকাস্থিত সঙ্গী-সাথী। তাদের দ্বারাই পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়। এই কাহিনীতে সাড়ে নয়শ' বছরের সুদীর্ঘ আয়ূষ্কাল, তার নবীসুলভ চেষ্টা-চরিত্র, অধিকাংশ উম্মতের বিরুদ্ধাচরণ এবং এর পরিণতিতে গুটিকতক ঈমানদার ছাড়া অবশিষ্ট সবার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, 'আদম 'আলাইহিস্ সালাম ও নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের মাঝখানে দশ 'করণ' বা প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়েছে।' [মুস্তাদরাক হাকেমঃ ২/৫৪৬] কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তার বয়স হয়েছিল নয়শ' পঞ্চাশ বছর। [সূরা আল-আনকাবূতঃ ১৪] কেউ কেউ বলেনঃ তিনি এক হাজার বছরই আয়ূ পেয়েছিলেন তন্মধ্যে নয়শ' পঞ্চাশ বছর প্লাবনের পূর্বে আর পঞ্চাশ বছর প্লাবনের পরে। উপরোক্ত আয়াতেও এ ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে। নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায় ইরাকে বসবাসকারী ছিল এবং শির্কে লিপ্ত

ছিল। তাদের শির্ক সম্পর্কে সুস্পষ্ট কথা এই যে, তারাই যমীনের বুকে সর্বপ্রথম শির্ক করেছিল। হাদীসে এসেছে যে, 'তাদের সম্প্রদায়ের পাঁচজন মহাব্যক্তিত্ব যাদের নাম যথাক্রমে- উদ্দ, সুওয়া', ইয়াগূস, ইয়া'উক ও নাসর; তারা অত্যন্ত নেককার লোক ছিলেন। হঠাৎ করেই তারা মারা যান। এতে করে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়ে। তখন শয়তান এসে তাদেরকে বলেঃ আমি কি তোমাদেরকে তাদের কিছু ছবি বানিয়ে দেব না, যাতে তোমরা তাদেরকে দেখে দেখে বেশী ইবাদাত করতে পার? তারা অনুমতি দিলে শয়তান কিছু ছবি বানিয়ে তাদের ইবাদাতখানার পিছনে টাঙিয়ে রাখে। পরবর্তী প্রজন্ম সেগুলোকে ইবাদাতখানার সম্মুখভাগে নিয়ে আসে এবং সেগুলোকে মূর্তির আকৃতি দান করে। তখনো তাদের ইবাদাত শুরু হয়নি। এ প্রজন্ম মারা যাওয়ার পরে পরবর্তী প্রজন্ম কি উদ্দেশ্যে এ মূর্তিগুলো স্থাপন করা হয়েছিল তা ভুলে গেলে শয়তান তাদের কাছে এসে বললঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এগুলোর ইবাদাত করত এবং এগুলোর উসিলায় আল্লাহ্‌র কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করত। শেষপর্যন্ত তারা এগুলোর ইবাদাত শুরু করে।' [বুখারীঃ ৪৯২০] আর এখান থেকেই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার উদ্ভব হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নূহে তার বিস্তারিত আলোচনা করে কিভাবে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের দাওয়াতের কিছু অংশ উল্লেখ করেছেন। তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে একথা বলেনঃ "হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।" এখানে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাতের দাওয়াত রয়েছে। এটাই সব নীতির মূলনীতি। তারপর শির্ক ও কুফর থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এটি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। অতঃপর ঐ মহাশাস্তির আশংকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা বিরুদ্ধাচরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এর অর্থ আখেরাতের মহাশাস্তিও হতে পারে এবং দুনিয়ার প্লাবনের শাস্তিও হতে পারে। তার সম্প্রদায়ের ملأ বা নেতা গোছের লোকেরা উত্তরে বললঃ আমরা মনে করি যে, তুমি প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে রয়েছ। কারণ, তুমি আমাদেরকে বাপ-দাদার দ্বীন পরিত্যাগ করতে বলছ। কেয়ামতে পুনরায় জীবিত হওয়া, প্রতিদান ও শাস্তি ইত্যাদি কুসংস্কার বৈ আর কিছু নয়।

এহেন পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ কথাবার্তার জবাবে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালাম নবীসুলভ ভাষায় যা বললেন, তা প্রচারক ও সংস্কারকদের জন্য একটি উজ্জ্বল শিক্ষা ও হেদায়াত। উত্তেজনার স্থলে উত্তেজিত ও ক্রোধান্বিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি সাদাসিধা ভাষায় তাদের সন্দেহ নিরসনে প্রবৃত্ত হলেন। বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন ভ্রষ্টতা নেই। তবে আমি তোমাদের ন্যায় পৈতৃক দ্বীনের অনুসারী নই; বরং বিশ্ব পালনকর্তার পক্ষ থেকে রাসূল। আমি যা কিছু

নবম রুকু'

৬৫. আর 'আদ(১) জাতির নিকট তাদের

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا

বলি, পালনকর্তার নির্দেশেই বলি এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণীসমূহ তোমাদের কাছে পৌঁছাই। এতে তোমাদের মঙ্গল। এতে না আল্লাহ্র কোন লাভ আছে এবং না আমার কোন স্বার্থ আছে। এরপর তারা যেহেতু নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামকে তাদের মত মানুষ হওয়ার কারণে রাসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করছিল, সেহেতু তিনি তার জবাবে বলেনঃ তোমরা কি এর ফলে বিস্মিত যে, তোমাদের পালনকর্তার বাণী তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও এবং রহমত লাভে ধন্য হও? অর্থাৎ তার ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর যাতে করে তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল হয়।

স্বজাতির মর্মন্তুদ কথাবার্তার জবাবে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের দয়ার্দ্র এবং শুভেচ্ছামূলক আচরণও চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তারা অন্ধভাবেই মিথ্যারোপ করে যেতে থাকল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ এর পরিণতিতে আমরা নূহ্ ও তার সঙ্গীদেরকে নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছি। নিশ্চয়ই তারা ছিল অন্ধ।

মোটকথা, এখানে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে- (এক) পূর্বতন সমস্ত নবী-রাসূলের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল অভিন্ন। (দুই) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে কঠিন বিপদেও রক্ষা করেন। (তিন) রাসূলদের প্রতি মিথ্যারোপ করা আল্লাহ্র আযাব ডেকে আনারই নামান্তর। পূর্ববর্তী উম্মতরা যেমন নবীগণের প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, এ কালের লোকদেরও এ থেকে ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়।

(১) 'আদ' ছিল আরবের প্রাচীনতম জাতি। 'আদ' প্রকৃতপক্ষে নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের পুত্র সামের বংশধরের এক ব্যক্তির নাম। তার বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় 'আদ' নামে খ্যাত হয়ে গেছে। কুরআনুল কারীমে 'আদের সাথে কোথাও 'আদে উলা' বা 'প্রথম আদ' এবং কোথাও আদ ইরাম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, 'আদ সম্প্রদায়কে 'ইরাম'ও বলা হয় এবং প্রথম 'আদের বিপরীতে কোন দ্বিতীয় 'আদও রয়েছে। এ সম্পর্কে তাফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, দ্বিতীয় 'আদ হলো সামূদ জাতি। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, 'আদ ও সামূদ উভয়ই ইরামের দু'শাখা। এক শাখাকে প্রথম 'আদ এবং

اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦٥﴾

ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না⁽¹⁾?’

অপর শাখাকে সামূদ অথবা দ্বিতীয় ‘আদ বলা হয়। ইরাম শব্দটি ‘আদ ও সামূদ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। [তাফসীর ইবন কাসীর; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

কুরআনের বর্ণনা মতে এ জাতিটির আবাসস্থল ছিল ‘আহকাফ’ এলাকা। এ এলাকাটি হিজায, ইয়ামন ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী ‘রুবয়ুল খালী’র দক্ষিন পশ্চিমে অবস্থিত। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে তারা ইয়ামানের পশ্চিম সমুদ্রোপকূল এবং ওমান ও হাদরামাউত থেকে ইরাক পর্যন্ত নিজেদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত করেছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ জাতিটির নিদর্শণাবলী দুনিয়ার বুক থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু দক্ষিন আরবের কোথাও কোথাও এখনো কিছু পুরাতন ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। সেগুলোকে আদ জাতির নিদর্শন মনে করা হয়ে থাকে।

(১) আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের হেদায়াতের জন্য হূদ ‘আলাইহিস্ সালামকে নবীরূপে প্রেরণ করেন। তিনি ‘আদ জাতিকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একত্ববাদের অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারের পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনৈশ্বর্যের মোহে মত্ত হয়ে তার আদেশ অমান্য করে। তারা শক্তিমত্ত হয়ে বলে বসলঃ “আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে”? [সূরা ফুসসিলাত: ১৫] এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম আযাব নাযিল হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্র শুষ্ক বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদস্বত্ত্বেও তারা শির্ক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করল না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব সওয়ার হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দালান-কোঠা মাটির সাথে মিশে যায়। মানুষ ও জীব-জন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে ‘আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়। তাই বলা হয়েছেঃ “আমরা মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি”। হূদ ‘আলাইহিস্ সালামের আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শির্কে লিপ্ত থাকার কারণে যখন ‘আদ জাতির উপর আযাব নাযিল হয়, তখন হূদ ‘আলাইহিস্ সালাম ও তার সঙ্গীদেরকে আল্লাহ্ রক্ষা করেন। হূদ ‘আলাইহিস্ সালাম ও তার সঙ্গীরা আযাব থেকে মুক্তি পেলেন। [বিস্তারিত ঘটনা দেখুন, ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

‘আদ জাতির উপর ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আযাব আসা কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্টভাবে

৬৬. তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা, যারা কুফরী করেছিল, তারা বলেছিল, ‘আমরা তো তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় নিপতিত দেখছি। আর আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি⁽১⁾।’

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرٰىكَ فِي سَفَاهَةٍ وَّإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٦٦﴾

৬৭. তিনি বললেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে একজন রাসূল⁽২⁾।’

قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٦٧﴾

৬৮. ‘আমি আমার রবের রিসালাত (যা নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা) তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি এবং

أُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾

উল্লেখিত রয়েছে। সুরা আল-মুমিনূনে নূহ্ ‘আলাইহিস্ সালামের কাহিনী উল্লেখ করার পর বলা হয়েছেঃ “অতঃপর আমি তাদের পরে আরো একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি”। বাহ্যতঃ এরাই হচ্ছে ‘আদ’ জাতি। পরে এ সম্প্রদায়ের কাজকর্ম ও কথাবার্তা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছেঃ একটি বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ ‘আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আযাব এসেছিল। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, বিকট শব্দ ও ঘূর্ণিঝড় উভয়টিই হয়েছিল। [তাফসীর ইবন কাসীর ৫/৪৭৪; সূরা আল-মুমিনূনের ৪১ নং আয়াতের তাফসীর]

(১) অর্থাৎ তারা মনে করতে থাকল যে, তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা বলছেন তা মিথ্যা। [মুয়াসসার] যদিও তারা তাকে ব্যক্তিগতভাবে মিথ্যাবাদী মনে করত না। কারণ নবীগণ সর্বযুগেই সত্যবাদী ছিলেন।

(২) অর্থাৎ সম্প্রদায়ের নেতা গোছের লোকেরা বললঃ “আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ধারণা তুমি একজন মিথ্যাবাদী।” এটা প্রায় নূহ্ ‘আলাইহিস্‌সালামের সম্প্রদায়ের প্রত্যুত্তরের মতই– শুধু কয়েকটি শব্দের পার্থক্য মাত্র। হূদ ‘আলাইহিস্‌সালাম এর উত্তরে বললেনঃ আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। ব্যাপার শুধু এতটুকুই যে, আমি বিশ্ব পালনকর্তার কাছ থেকে রাসূল হয়ে এসেছি। তাঁর বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছাই। আমি সুস্পষ্টভাবে তোমাদের হিতাকাংখী। তাই তোমাদের পৈত্রিক মুর্খতায় তোমাদের সঙ্গী হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য কথা তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই। কিন্তু তা তোমাদের মনঃপুত নয়।

আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাংখী।

৬৯. ‘তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের একজনের মাধ্যমে তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্য উপদেশ এসেছে(১)? এবং স্মরণ কর যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের (ধ্বংসের) পরে তোমাদেরকে (তোমাদের আগের লোকদের) স্থলাভিষিক্ত করেছেন(২) এবং সৃষ্টিতে (দৈহিক গঠনে) তোমাদেরকে বেশী পরিমাণে হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ করেছেন। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহসমূহ স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।’

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ ۗ وَاذْكُرُوْٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٦٩﴾

৭০. তারা বলল, ‘তুমি কি আমাদের কাছে এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে, আমরা যেন এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করি এবং আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদাত

قَالُوْٓا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ۚ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٧٠﴾

---

(১) এখানে ‘আদ জাতির সে আপত্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের পূর্বে নূহ্ ‘আলাইহিস্‌সালামের সম্প্রদায় উত্থাপন করেছিল। অর্থাৎ আমরা নিজেদেরই মত কোন মানুষকে নেতারূপে কিভাবে মেনে নিতে পারি? কোন ফিরিশ্‌তা হলে মেনে নেয়া সম্ভবপর ছিল। এর উত্তরেও হূদ ‘আলাইহিস্ সালাম তেমনি জবাব দিয়েছিলেন, যা নূহ্ ‘আলাইহিস্ সালাম দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কোন মানুষ আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে মানুষকে ভয় প্রদর্শনের জন্য আসবেন। কেননা, মানুষকে বুঝানোর জন্য মানুষেরই নবী হওয়া বাস্তবসম্মত হতে পারে।

(২) ‘আদ জাতির পূর্বে নূহ্ ‘আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের উপর পতিত মহাশক্তির স্মৃতি তখনো মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই হূদ ‘আলাইহিস্ সালাম আযাবের কঠোরতা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করেননি। বরং এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তোমরা কি ভয় করনা?

করত তা ছেড়ে দেই(১)? কাজেই তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যা ভয় দেখাচ্ছ(২) তা নিয়ে এস।’

قَالَ قَدۡ وَقَعَ عَلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ رِجۡسٞ
وَغَضَبٌۖ أَتُجَٰدِلُونَنِي فِيٓ أَسۡمَآءٖ سَمَّيۡتُمُوهَآ
أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٖۚ
فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلۡمُنتَظِرِينَ ٧١

৭১. তিনি বললেন, ‘তোমাদের রবের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের উপর নির্ধারিত হয়েই আছে; তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতগুলি নাম সম্বন্ধে যেগুলোর নাম তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখেছ(৩), যে সম্বন্ধে

---

(১) এখানে একথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ জাতিটিও আল্লাহকে অস্বীকার করতো না, আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল না। অথবা তাঁর ইবাদাত করতে অস্বীকার করছিল না। আসলে তারা হুদ আলাইহিস্‌সালামের একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে এবং তাঁর ইবাদাতের সাথে আর কারোর ইবাদাত যুক্ত করা যাবে না- এ বক্তব্যটি মেনে নিতে অস্বীকার করছিল।

(২) মূলে تَعِدُنَا শব্দ এসেছে। যার সাধারণ অর্থ, ‘তুমি যার ওয়াদা আমাদের কাছে করছ’। কিন্তু এখানে খারাপ কোন পরিণতির ভয় প্রদর্শন উদ্দেশ্য। [মুয়াসসার] আলেমগণ বলেন, এখানে وعد শব্দটি وعيد এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আ'রাফের ৭৭, সূরা হূদ এর ৩২ এবং সূরা আল-আহকাফের ২২ নং আয়াতেও এ শব্দটি একই অর্থে এসেছে।

(৩) অর্থাৎ তোমরা কাউকে বৃষ্টির দেবতা, কাউকে বায়ূর দেবতা, কাউকে ধন-সম্পদের দেবতা, আবার কাউকে রোগের দেবতা বলে থাকো। অথচ তাদের কেউ মূলতঃ কোন জিনিসের স্রষ্টা ও প্রতিপালক নয়। বর্তমান যুগেও আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখি। এ যুগেও লোকেরা দেখি কাউকে বিপদ মোচনকারী বলে থাকে। অথচ বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতাই তার নেই। লোকেরা কাউকে ‘গন্‌জ বখশ’ (গুপ্ত ধন ভান্ডার দানকারী) বলে অভিহিত করে থাকে। অথচ তার কাছে কাউকে দান করার মত কোন ধনভান্ডার নেই। কাউকে ‘গরীব নওয়াজ’ আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। অথচ তিনি নিজেই গরীব। যে ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ফলে কোন গরীবকে প্রতিপালন ও তার প্রতি অনুগ্রহ করা যেতে পারে সেই ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে তার কোন অংশ নেই। কাউকে ‘গাউস’ (ফরিয়াদ শ্রবণকারী) বলা হয় অথচ কারোর ফরিয়াদ শুনার এবং তার প্রতিকার করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। কাজেই এ ধরনের যাবতীয় নাম বা উপাধি নিছক নাম বা উপাধি ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নামগুলোর পিছনে কোন সত্তা বা ব্যক্তিত্ব নেই। যারা এগুলো নিয়ে ঝগড়া ও বিতর্ক করে তারা আসলে

আল্লাহ্ কোন সনদ নাযিল করেননি⁽¹⁾? কাজেই তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।’

৭২. তারপর আমরা তাকে ও তার সাথীদেরকে আমাদের অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম; আর আমাদের আয়াতসমূহে যারা মিথ্যারোপ করেছিল এবং যারা মুমিন ছিল না তাদেরকে নির্মূল করেছিলাম(২)।

فَأَنجَيْنَٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَمَا كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٧٢﴾

দশম রুকূ‘

৭৩. আর সামূদ(৩) জাতির নিকট তাদের

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا قَالَ يَٰقَوْمِ

কোন বাস্তব জিনিসের জন্য নয়, বরং কেবল কতিপয় নামের জন্যই ঝগড়া ও বিতর্ক করে।

(১) অর্থাৎ তোমরা নিজেরাই যে আল্লাহকে সর্বশ্রেষ্ট রব বলে থাকো তিনি তোমাদের এ বানোয়াট ইলাহদের সার্বভৌম ক্ষমতা-কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের সপক্ষে কোন সনদ দান করেননি। তিনি কোথাও বলেননি যে, আমি অমুকের ও অমুকের কাছে আমার ইলাহী কর্তৃত্বের এ পরিমাণ অংশ স্থানান্তরিত করে দিয়েছি। কাউকে ‘বিপদত্রাতা’ অথবা ‘গনজ বখশ’ বা ‘গাউস’ হবার কোন পরোয়ানা তিনি দেননি। তোমরা নিজেরাই নিজেদের ধারণা ও কল্পনা অনুযায়ী তাঁর ইলাহী ক্ষমতার যতটুকু অংশ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করে দিয়েছো।

(২) এ অনুবাদটি এ হিসেবে যে, তাদের ধ্বংসের কারণ দু’টি। তারা মিথ্যারোপ করেছিল এবং ঈমান না এনে কুফরী করেছিল। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আয়াতের অর্থ এভাবেও করা যায় যে, যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করেছিল তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি। আর তারা ঈমান গ্রহণকারী ছিল না, কারণ তারা আয়াতসমূহের উপর মিথ্যারোপ এবং সৎকাজ ছেড়ে দিয়েছিল। [মুয়াসসার]

(৩) সামূদ আরবের প্রাচীন জাতিগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় জাতি। আদ জাতির পরে এরাই সবচেয়ে বেশী খ্যাতি ও পরিচিতি অর্জন করে। উত্তর-পশ্চিম আরবের যে এলাকাটি আজো ‘আল হিজর’ নামে খ্যাত, সেখানেই ছিল এদের আবাস। আজকের সাউদী আরবের অন্তর্গত মদীনা ও তাবুকের মাঝখানে মদীনা থেকে প্রায় ২৫০ কিঃমিঃ দূরে একটি স্টেশন রয়েছে, তার নাম মাদায়েনে সালেহ। এটিই ছিল সামূদ জাতির কেন্দ্রীয় স্থান। সামূদ জাতির লোকেরা পাহাড় কেটে যেসব বিপুলায়তন ইমারত

اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ
جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ
اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْۤ اَرْضِ
اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ
اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾

ভাই সালেহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই। অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে(১)।

নির্মাণ করেছিল এখনো অনেক এলাকা জুড়ে সেগুলো অবস্থান করছে। [ড.শাওকী আবু খালীল, আতলাসুল কুরআন, পৃ. ৩৪-৩৬]

(১) অর্থাৎ এখন তো একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে। এ নিদর্শনের অর্থ একটি আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী। এ আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে এবং কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। এ উষ্ট্রির ঘটনা এই যে, সালেহ্ ‘আলাইহিস্ সালাম যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজেই বার্ধক্যের দ্বারে উপনীত হন। তার পীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তার কাছে এমন একটি দাবী করতে হবে যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং আমরা তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করব। সে মতে তারা দাবী করল যে, তুমি যদি বাস্তবিকই আল্লাহ্‌র নবী হও, তবে আমাদেরকে পাহাড়ের ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে দেখাও।

সালেহ্ ‘আলাইহিস্‌সালাম প্রথমে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবী পূরণ করে দেই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কি না? সবাই যখন এই মর্মে অঙ্গীকার করল, তখন সালেহ্ ‘আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করলেন। দো‘আর সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে স্পন্দন দেখা গেল এবং একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভেতর থেকে দাবীর অনুরূপ একটি উষ্ট্রী বের হয়ে এল।

সালেহ্ ‘আলাইহিস্ সালামের এ বিস্ময়কর মু‘জিযা দেখে কিছু লোক তৎক্ষণাৎ ঈমান এনে ফেলল এবং অবশিষ্টরাও ঈমান আনার ইচ্ছা করল, কিন্তু দেব-দেবীদের বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপূজার ঠাকুর ধরণের কিছু সর্দার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। সালেহ্ ‘আলাইহিস্‌সালাম স্বীয় সম্প্রদায়কে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে শংকিত হলেন যে, এদের উপর আযাব এসে যেতে পারে। তাই নবীসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেনঃ এ উষ্ট্রীর দেখাশোনা কর। একে কোনরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়ত তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হবে। আয়াতে এ উষ্ট্রীকে ‘আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী’ বলা হয়েছে কারণ, এটি আল্লাহ্‌র আসীম শক্তির নিদর্শন এবং সালেহ্ ‘আলাইহিস্

এটি আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং তোমরা তাকে আল্লাহ্‌র যমীনে চরে খেতে দাও এবং তাকে কোন কষ্ট দিও না, দিলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে পেয়ে বসবে(১)।

৭৪. 'আর স্মরণ কর, 'আদ জাতির (ধ্বংসের) পরে তিনি তোমাদেরকে (তোমাদের আগের লোকদের)

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ
وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ

সালামের মু'জিযা হিসেবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, ঈসা 'আলাইহিস্ সালামের জন্মও অলৌকিক পন্থায় হয়েছিল বলে তাকে রূহুল্লাহ্ বা 'আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আত্মা' বলা হয়েছে। এর দ্বারা ঈসাকে সম্মানিত করাই উদ্দেশ্য।

সামূদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তুদেরকে পান করাত, এ উষ্ট্রীও সে কূপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরণের উষ্ট্রী যখন পানি পান করত, তখন পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে ফয়সালা করে দিলেন যে, একদিন এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নিবে। কুরআনের অন্যত্র এভাবে পানি বন্টনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ "হে সালেহ্, আপনি স্বজাতিকে বলে দিন যে, কূপের পানি তাদের এবং উষ্ট্রীর মধ্যে বন্টন হবে।" অর্থাৎ একদিন উষ্ট্রীর এবং পরবর্তী দিন তাদের।[বিস্তারিত দেখুন, তাফসীর ইবন কাসীর ও আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া]

(১) জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজর এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বললেন, তোমরা নিদর্শন চেয়ো না। সালেহ এর কাওম নিদর্শন চেয়েছিল। ফলে সেটা এ রাস্তা দিয়ে ঢুকত আর ঐ রাস্তা দিয়ে বের হত। শেষ পর্যন্ত তারা তাদের রবের নির্দেশ অমান্য করল এবং উষ্ট্রীকে হত্যা করল। সে উষ্ট্রীর জন্য একদিনের পানি নির্দিষ্ট ছিল, আর তাদের জন্য তার দুধ নির্ধারিত ছিল অপরদিন। কিন্তু তারা সেটাকে হত্যা করল। তখন তাদেরকে এক বিকট চিৎকার পেয়ে বসল। যা আসমানের নীচে তাদের যারা ছিল তাদের সবাইকে নিস্তেজ করে দিল। তবে একজন ছাড়া। সে ছিল আল্লাহ্‌র হারামে (মক্কায়)। বলা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে লোকটি কে? তিনি বললেন, সে হচ্ছে, আবু রিগাল। কিন্তু সে যখনই হারাম থেকে বের হল তখনই তার পরিণতি তা-ই হয়েছিল যা তার সম্প্রদায়ের হয়েছিল।' [মুসনাদে আহমাদ ৩/২৯৬; মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৩২০]

স্থলাভিষিক্ত করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে যমীনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ ও পাহাড় কেটে ঘরবাড়ি তৈরী করছ(১)। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না(২)।'

سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٧٤﴾

৭৫. তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা সে সম্প্রদায়ের যারা ঈমান এনেছিল- যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি জান যে, সালিহ্‌ তার রব এর পক্ষ থেকে প্রেরিত?' তারা বলল, 'নিশ্চয় তিনি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, আমরা তার উপর ঈমানদার।'

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٧٥﴾

৭৬. যারা অহংকার করেছিল তারা বলল, 'নিশ্চয় তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তাতে কুফরীকারী(৩)।'

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٧٦﴾

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত স্মরণ কর যে, তিনি 'আদ জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে তোমাদেরকে অভিষিক্ত করেছেন। তাদের ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তি তোমাদেরকে দান করেছেন এবং তোমাদেরকে এ শিল্পকার্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, উন্মুক্ত জায়গায় তোমরা প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে তাতে প্রকোষ্ঠ তৈরী কর।

(২) আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, দ্বীনের মূল বিশ্বাসসমূহে সব নবীই একমত। সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা।

(৩) এখানে সামূদ জাতির দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। একদল সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী কাফেরদের। বলা হয়েছেঃ সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহংকারী ছিল, তারা যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হত-অর্থাৎ যারা

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوۡا عَنۡ اَمۡرِ رَبِّهِمۡ وَقَالُوۡا يٰصٰلِحُ ائۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنۡ كُنۡتَ مِنَ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ۝

৭৭. অতঃপর তারা সে উষ্ট্রীকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, ‘হে সালিহ্! তুমি আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে এস, যদি তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।’

فَاَخَذَتۡهُمُ الرَّجۡفَةُ فَاَصۡبَحُوۡا فِىۡ دَارِهِمۡ جٰثِمِيۡنَ ۝

৭৮. অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে (মরে) রইল(১)।

বিশ্বাস স্থাপন করেছিল-তাদেরকে বললঃ তোমরা কি বাস্তবিকই জান যে, সালেহ্ ‘আলাইহিস্ সালাম তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল? উত্তরে মুমিনরা বললঃ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে হেদায়াতসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী। সামূদ জাতির মুমিনরা কি চমৎকার উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, তিনি রাসূল কি না। আসলে এটা আলোচনার বিষয়ই নয়; বরং জাজ্বল্যমান ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেন, তা আল্লাহ্ তা‘আলার কাছ থেকে আনীত বাণী। জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছু থাকলে তা এই যে, কে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে না? আল্লাহ্‌র দয়ায় আমরা তার আনীত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী। কিন্তু তাদের এ অলংকারপূর্ণ উত্তর শুনেও সামূদ জাতি পূর্ববৎ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বললঃ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, ধন-সম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে আল্লাহ্ তা‘আলা নিরাপদ রাখুন। এগুলো মানুষের চোখে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা জাজ্বল্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে।

(১) পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সালেহ্ ‘আলাইহিস্ সালামের দো‘আয় পাহাড়ের একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক উষ্ট্রী বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহ্ তা‘আলা এ উষ্ট্রীকেই এ সম্প্রদায়ের জন্য সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। সেমতে সে জনপদের সব মানুষ ও জীব-জন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করত, উষ্ট্রী তার সব পানি পান করে ফেলত। তাই সালেহ্ ‘আলাইহিস্ সালাম তাদের জন্য পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, একদিন উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন জনপদের অধিবাসীরা। সুতরাং এ উষ্ট্রীর কারণে জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু আযাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হত না। কিন্তু তাদের সম্প্রদায়ের এক যুবক উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে পড়ল। সে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল এবং তরবারীর আঘাতে তার পা কেটে হত্যা করল। কুরআনুল কারীম তাকেই সামূদ জাতির সর্ববৃহৎ

হতভাগ্য লোক বলে আখ্যা দিয়ে বলেছেঃ ﴿ إِذِ انۢبَعَثَ أَشۡقَىٰهَا ﴾ [সূরা আস্-শামসঃ ১২] কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় আযাবে পতিত হয়।

উষ্ট্রী হত্যার ঘটনা জানার পর সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জীবন কাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রয়েছে। এরপরই আযাব নেবে আসবে। এ ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জাতির দুঃসময় ঘনিয়ে আসে, তার জন্য কোন উপদেশ ও হুশিয়ারী কার্যকর হয় না। হতভাগ্য জাতি একথা শুনেও ক্ষমা ও প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামকেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আযাব আসেই, তবে আমরা নিজেদের পূর্বে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দেই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। সামূদ জাতির এ সংকল্পের বিষয় কুরআনুল কারীমের অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের বেলা সালেহ্ 'আলাইহিস্ সালামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার গৃহপানে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পথিমধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ "তারাও গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও প্রত্যুত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে, তারা তা জানতেই পারল না।" [সূরা আন্-নমলঃ ৫০] শেষপর্যন্ত ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অধঃমুখী হয়ে ভূশায়ী হল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ভূমিকম্পের কথা উল্লেখিত রয়েছে। অন্যান্য আয়াতে ভীষণ চিৎকার ও বিকট শব্দের কথা এসেছে। উভয় আয়াতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের উপর উভয় প্রকার আযাবই এসেছিল; নীচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার।

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামূদ জাতির উপর আযাব এসেছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আযাব-বিধ্বস্ত এলাকার ভেতরে প্রবেশ কিংবা এর কূপের পানি ব্যবহার না করে। আর যদি ঢুকতেই হয় তবে যেন ক্রন্দনরত অবস্থায় ঢুকে [দেখুন, বুখারীঃ ৪৩৩, ৩৩৭৮, ৩৩৭৯, ৩৩৮১, ৪৭০২, ৪৪২০, মুসলিমঃ ২৯৮০, ২৯৮১, মুসনাদে আহমাদঃ ২/৬৬, ১১৭, ৭২, ৯১]

কোন কোন হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সামূদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে আবু রেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় এসেছিল। মক্কার হারামের সম্মানার্থে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন সে হারাম থেকে বাইরে যায়, তখন সামূদ জাতির আযাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও মৃত্যুমুখে

৭৯. এরপর তিনি তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার রবের রিসালত (যা নিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা) তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দ কর না(১)।’

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٧٩﴾

৮০. আর আমি লূতকেও(২)

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ

পতিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে মক্কার বাইরে আবু রেগালের কবরের চিহ্নও দেখান এবং বলেনঃ তার সাথে স্বর্ণের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরাম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। [দেখুন, মুসনাদে আহমাদঃ ৩/২৯৬, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩৪০, ৩৪১, সহীহ ইবন হিব্বানঃ ৬১৯৭]

এসব আযাব-বিধ্বস্ত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলোকে আল্লাহ্ তা‘আলা ভবিষ্যৎ লোকদের জন্য শিক্ষাস্থল হিসেবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কুরআনুল কারীম আরবদেরকে বার বার হুশিয়ার করেছে যে, তোমাদের সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজো শিক্ষার কাহিনী হয়ে বিদ্যমান রয়েছে।

(১) স্বজাতির উপর আযাব নাযিল হওয়ার পর সালেহ্ ‘আলাইহিস্ সালাম ও ঈমানদারগণ সে এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। সালেহ্ ‘আলাইহিস্ সালাম প্রস্থানকালে জাতিকে সম্বোধন করে বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি, কিন্তু আফসোস, তোমারা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দই কর না।

(২) লূত ‘আলাইহিস্ সালাম ছিলেন ইব্‌রাহীম ‘আলাইহিস্ সালামের ভ্রাতুষ্পুত্র। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং ইব্‌রাহীম ‘আলাইহিস্ সালামের পরিবারও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা ইব্‌রাহীম ‘আলাইহিস্ সালামকে নবী করে পাঠান। কিন্তু সবাই তার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরূদের অগ্নি পর্যন্ত গড়ায়। স্বয়ং পিতা তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করার হুমকি দেন। নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু স্ত্রী সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লূত মুসলিম হন। অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে ইব্‌রাহীম ‘আলাইহিস্ সালাম দেশ ছেড়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইব্‌রাহীম ‘আলাইহিস্

সালাম বায়তুল মোকাদ্দাসের অদূরেই বসতি স্থাপন করেন।

লূত ‘আলাইহিস্ সালামকেও আল্লাহ্ তা‘আলা নবুওয়াত দান করে জর্দান ও বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদূমের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেন। এ এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় বড় শহর ছিল। কুরআনুল কারীম বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে ‘মু’তাফেকা’ ও ‘মু’তাফেকাত’ শব্দে বর্ণনা করেছে। এসব শহরের মধ্যে সাদূমকেই রাজধানী মনে করা হত। লূত ‘আলাইহিস্ সালাম এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্যশ্যামল। এখানে সর্ব প্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। আল্লাহ্ তা‘আলা লূত ‘আলাইহিস্ সালামকে তাদের হেদায়াতের জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে সম্বোধন করে বলেনঃ “তোমরা এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি।” অর্থাৎ লূত ‘আলাইহিস্ সালামের জাতি নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করত। এটা ছিল এমন কাজ যা এর পূর্বে কোন জাতি করেনি। এজন্য আল্লাহ্ তা‘আলা বলছেনঃ তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের আসল রোগ। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ডিঙ্গিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছ। লূত ‘আলাইহিস্ সালামের উপদেশের জবাবে তার সম্প্রদায় বললঃ এরা বড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবী করে। এদের চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্তি থেকে বের করে দাও। তখন গোটা জাতিই আল্লাহ্র আযাবে পতিত হল। শুধু লূত ‘আলাইহিস্ সালাম ও তার কয়েকজন সঙ্গী আযাব থেকে বেঁচে রইলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ “আমি লূত ও তার পরিবারকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি।” কারণ, লূত ‘আলাইহিস্ সালামের ঘরের লোকেরাই শুধু মুসলিম ছিল। সুতরাং তারাই আযাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তার স্ত্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সারকথা এই যে, গোণা-গুণতি কয়েকজন মুসলিম ছিল। তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা লূত ‘আলাইহিস্ সালামকে নির্দেশ দেন যে, স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীল লোককে নিয়ে শেষ রাত্রে বস্তি থেকে বের হয়ে যান এবং পিছনে ফিরে দেখবেন না। কেননা, আপনি যখন বস্তি থেকে বের হয়ে যাবেন, তখনই কালবিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে। লূত ‘আলাইহিস্ সালাম এ নির্দেশ মত স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীলদেরকে নিয়ে শেষ রাত্রে সাদূম ত্যাগ করেন। তার স্ত্রী প্রসঙ্গে দু’রকম বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি। দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, কিছু দূর সঙ্গে চলার পর আল্লাহ্র নির্দেশের বিপরীতে পিছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। ফলে সাথে সাথে আযাব এসে তাকেও পাকড়াও করল। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাদের উপর আপতিত আযাব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ যখন আমার আযাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝٨٠

পাঠিয়েছিলাম(১)। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, ‘তোমরা কি এমন খারাপ কাজ করে যাচ্ছ যা তোমাদের আগে সৃষ্টিকুলের কেউ করেনি?

اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۭ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝٨١

৮১. ‘তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারীদের ছেড়ে পুরুষের কাছে যাও, বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।’

স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি এ কাফেরদের থেকে বেশী দূরে নয়।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নীচে থেকে জীব্‌রাঈল ‘আলাইহিস্ সালাম গোটা ভূখণ্ডকে উপরে তুলে উল্টে দিয়েছেন। সূরা আল-হিজরের আয়াতে এ আযাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছেঃ সূর্যোদয়ের সময় বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। লূত ‘আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আযাবসমূহের মধ্যে ভূখণ্ড উল্টে দেয়ার আযাবটি তাদের অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজের সাথে বিশেষ সঙ্গতিও রাখে। কারণ, তারা সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল। সূরা হূদের বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে আল্লাহ্ তা‘আলা আরবদেরকে হুশিয়ার করে এ কথাও বলেছে যে, উল্টে দেয়া বস্তিগুলো যালেমদের কাছ থেকে বেশী দূরে নয়। সিরিয়া গমনের পথে সব সময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। এ দৃশ্য শুধু কুরআন নাযিলের সময়েরই নয়, আজও বিদ্যমান রয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখণ্ডটি ‘লূত সাগর’ অথবা ‘মৃত সাগর’ নামে পরিচিতি। এর ভূ-ভাগ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক নীচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশে নদীর আকারে আশ্চর্য ধরণের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে মৃত সাগর বলা হয়। কথিত আছে, এটাই সাদূমের অবস্থান স্থল। [ড.শাওকী আবু খালীল, আতলাসুল কুরআন, পৃ. ৫৭-৬১]

(১) বর্তমানে যে এলাকাটিকে ট্রান্স জর্দান বলা হয় সেখানেই ছিল এ জাতিটির বাস। ইরাক ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী স্থানে এ এলাকাটি অবস্থিত। এ এলাকা এমনই শ্যামল সবুজে পরিপূর্ণ ছিল যে, মাইলের পর মাইল জুড়ে এ বিস্তৃত এলাকা যেন একটি বাগান মনে হতো। এ এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানুষকে মুগ্ধ ও বিমোহিত করত। কিন্তু আজ এ জাতির নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমনকি তাদের জনপদগুলো কোথায় কোথায় অবস্থিত ছিল তাও আজ সঠিকভাবে জানা যায় না। মৃত সাগরই তাদের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে টিকে আছে।

৮২. উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, ‘এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বহিস্কার কর, এরা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায়।’

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾

৮৩. অতঃপর আমরা তাকে ও তার পরিজনদের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম, তার স্ত্রী ছাড়া, সে ছিল পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿٨٣﴾

৮৪. আর আমরা তাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। কাজেই দেখুন, অপরাধীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল(১)।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

এগারতম রুকূ‘

৮৫. আর মাদ্‌য়ানবাসীদের(২) নিকট তাদের

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ‘আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বেশী ভয় পাচ্ছি যে, তারা লুতের জাতির কাজ করে বসবে’। [তিরমিযীঃ ১৪৫৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য যবেহ করে আল্লাহ্ তাকে লা‘নত করেছেন, যে ব্যক্তি যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে তাকে আল্লাহ্ লা‘নত করেছেন, যে ব্যক্তি কোন অন্ধ ব্যক্তিকে পথ ভুলিয়ে দেয় তাকে আল্লাহ্ লা‘নত করেছেন, যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে গালি দেয় আল্লাহ্ তাকে লা‘নত করেছেন, যে ব্যক্তি তার আপন মনিব ব্যতীত অন্য কাউকে মনিব বানায় আল্লাহ্ তাকে লা‘নত করেছেন, আর যে ব্যক্তি লুতের জাতির কাজ করে তাকেও আল্লাহ্ লা‘নত করেছেন, আর যে ব্যক্তি লুতের জাতির কাজ করে তাকেও আল্লাহ্ লা‘নত করেছেন, আর যে ব্যক্তি লুতের জাতির কাজ করে তাকেও আল্লাহ্ লা‘নত করেছেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩০৯] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘যদি কাউকে তোমরা লুত জাতির কাজ করতে দেখ তবে যে এ কাজ করছে এবং যার সাথে করা হচ্ছে উভয়কে হত্যা কর’। [আবু দাউদঃ ৪৪৬২]

(২) মাদ্‌ইয়ানবাসীদের মূল এলাকাটি হেজাযের উত্তর পশ্চিমে এবং ফিলিস্তিনের দক্ষিণে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন যুগে যে বাণিজ্যিক সড়কটি লোহিত সাগরের উপকূল ধরে ইয়েমেন থেকে মক্কা ও ইয়াম্বু হয়ে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং দ্বিতীয় যে বাণিজ্যিক সড়কটি ইরাক থেকে মিশরের

ভাই শু‘আইবকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন সত্য ইলাহ্ নেই; তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। কাজেই তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না; তোমরা মুমিন হলে তোমাদের জন্য এটাই কল্যাণকর।’

اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ
جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ
وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ
ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۸۵﴾

৮৬. ‘আর তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য, আল্লাহ্‌র পথ থেকে বাধা দিতে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করতে তোমরা প্রতিটি পথে বসে থেকো না।’ আর স্মরণ কর, ‘তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তা লক্ষ্য কর।’

وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ
وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ
وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۚ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ كُنْتُمْ
قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۸۶﴾

৮৭. ‘আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোন দল ঈমান আনে

وَاِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا

দিকে চলে যেতো তাদের ঠিক সন্ধিস্থলে এ জাতির জনপদগুলো অবস্থিত ছিল। এ কারণে আরবের লোকেরা মাদইয়ান জাতি সম্পর্কে জানতো। কারণ তাদের ব্যবসাও এ পথে চলাচল করতো।

মাদ্ইয়ানের বর্তমান নাম ‘আল বিদা‘। এ এলাকাটি একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। সৌদী আরবের শেষ প্রান্তে মিশরের সীমান্ত সংলগ্ন এ এলাকায় এখনো শু‘আইব আলাইহিস সালামের জাতির বিভিন্ন চিহ্ন রয়ে গেছে। যা ‘মাগায়েরে শু‘আইব নামে খ্যাত। [ড.শাওকী আবু খালীল, আতলাসুল কুরআন, পৃ. ৭২]

بِالَّذِيْٓ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا
فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ
خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ٨٧

এবং কোন দল ঈমান না আনে, তবে ধৈর্য ধর, যতক্ষন না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ।’

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ
لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ
قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ۚ قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ٨٨

৮৮. তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতারা বলল, ‘হে শু‘আইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে ।’ তিনি বললেন, ‘যদিও আমরা সেটাকে ঘৃণা করি তবুও?’

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ
اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ۗ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ
اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ۗ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ
عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۗ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا
بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ٨٩

৮৯. ‘তোমাদের ধর্মাদর্শ থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করব। আর আমাদের রব আল্লাহ্ ইচ্ছে না করলে তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের জন্য সমীচীন নয় । সবকিছুই আমাদের রবের জ্ঞানের সীমায় রয়েছে, আমরা আল্লাহ্‌র উপরই নির্ভর করি । হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফয়সালা করে দিন এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ।’

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَىِٕنِ اتَّبَعْتُمْ
شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ٩٠

৯০. আর তার সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা বলল, ‘তোমরা যদি শু‘আইবকে অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ।’

৯১. অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে (মরে) রইল।	فَاَخَذَتۡهُمُ الرَّجۡفَةُ فَاَصۡبَحُوۡا فِىۡ دَارِهِمۡ جٰثِمِيۡنَ ۚۛ ﴿۹۱﴾
৯২. শু'আইবকে যারা মিথ্যাবাদী বলেছিল, মনে হল তারা যেন কখনো সেখানে বসবাসই করেনি। শু'আইবকে যারা মিথ্যাবাদী বলেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।	الَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا شُعَيۡبًا كَاَنۡ لَّمۡ يَغۡنَوۡا فِيۡهَا ۛۚ اَلَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا شُعَيۡبًا كَانُوۡا هُمُ الۡخٰسِرِيۡنَ ﴿۹۲﴾
৯৩. অতঃপর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার রবের রিসালাত (প্রাপ্ত বাণী) আমি তো তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। সুতরাং আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করি(১)!'	فَتَوَلّٰى عَنۡهُمۡ وَقَالَ يٰقَوۡمِ لَقَدۡ اَبۡلَغۡتُكُمۡ رِسٰلٰتِ رَبِّىۡ وَنَصَحۡتُ لَكُمۡ ۚ فَكَيۡفَ اٰسٰى عَلٰى قَوۡمٍ كٰفِرِيۡنَ ﴿۹۳﴾

---

(১) শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কুরআনুল কারীমে কোথাও তাদেরকে 'আহ্‌লে মাদ্‌ইয়ান' ও 'আসহাবে মাদ্‌ইয়ান' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার কোথাও 'আসহাবে আইকাহ্' নামে। 'আইকাহ্' শব্দের অর্থ জঙ্গল ও বন। কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ 'আসহাবে মাদ্‌ইয়ান' ও 'আসহাবে আইকাহ্' পৃথক পৃথক জাতি। তাদের বাসস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম প্রথমে এই জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। উভয় জাতির উপর যে আযাব আসে, তার ভাষাও বিভিন্ন রূপ। আসহাবে মাদ্‌ইয়ানের উপর কোথাও صيحة এবং কোথাও رجفة এবং আসহাবে আইকাহ্‌র উপর কোথাও ظلة -এর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। صيحة শব্দের অর্থ বিকট চিৎকার এবং ভীষণ শব্দ। رجفة শব্দের অর্থ ভূমিকম্পন এবং ظلة শব্দের অর্থ ছায়াযুক্ত ছাদ, শামিয়ানা। আসহাবে আইকাহ্‌র উপর এভাবে আযাব নাযিল করা হয় যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের বস্তিতে ভীষণ গরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে। অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা দেয়। ফলে জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং শীতল বাতাস বইতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে বস্তির সবাই জঙ্গলে জমায়েত হয়। এভাবে অপরাধীরা কোনরূপ গ্রেফতারী পরোয়ানা ও সিপাই-সান্ত্রীর প্রহরা ছাড়াই নিজ পায়ে

হেঁটে বধ্যভূমিতে গিয়ে পৌঁছে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়, তখন মেঘমালা থেকে অগ্নি বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং নীচের দিকে শুরু হয় ভূমিকম্পন। ফলে সবাই নাস্তানাবুদ হয়ে যায়।

কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ 'আসহাবে মাদ্ইয়ান' ও 'আসহাবে আইকাহ্' একই সম্প্রদায়ের দুই নাম। পূর্বোল্লেখিত তিন প্রকার আযাবই তাদের উপর নাযিল হয়েছিল। প্রথমে মেঘমালা থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়, অতঃপর বিকট চীৎকার শোনা যায় এবং সবশেষে ভূমিকম্পন হয়। ইবনে কাসীর এ তাফসীরেরই প্রবক্তা। [আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস, পৃ. ২৮৫-২৯৩]

মোটকথা, উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হোক কিংবা একই সম্প্রদায়ের দু'নাম হোক শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম তাদের কাছে তাওহীদের বাণীই পৌঁছান। তারা শির্কের পাশাপাশি এমনকিছু কুকর্মে লিপ্ত ছিল, যা থেকে শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম তাদেরকে নিষেধ করেন। তারা একদিকে আল্লাহ্র হক নষ্ট করছিল, অপরদিকে বান্দার হকও নষ্ট করছিল। তারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাদের নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে আল্লাহ্র হকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। এর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ে মাপ ও ওজনে কম দিয়ে বান্দাদের হক নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে থাকত এবং পথিকদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুটে নিত এবং শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধা দিত। তারা এভাবে ভূ-পৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এসব অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের হেদায়াতের জন্য শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম প্রেরিত হয়েছিলেন। শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম তাদের সংশোধনের জন্য তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমতঃ তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত কর। তিনি ব্যতীত ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। একত্ববাদের এ দাওয়াতই সব নবী দিয়ে এসেছেন। এটিই সব বিশ্বাস ও কর্মের প্রাণ। এ সম্প্রদায়ও সৃষ্ট বস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী ও হক সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম এ বাণী পৌঁছানো হয়েছে। আরো বলা হয়েছেঃ তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। এখানে 'সুস্পষ্ট প্রমাণ'-এর অর্থ ঐসব মু'জিযা, যা শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের হাতে প্রকাশ পেয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষের দ্রব্যাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না। এতে প্রথমে একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দিয়ে করা হত। অতঃপর সর্ব প্রকার হকে ত্রুটি করাকে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা ধন-সম্পদ, ইয্যত-আবরু অথবা অন্য যে কোন বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন। এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওজনে পাওনার চাইতে কম দেয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্যান্য হকে ত্রুটি করাও হারাম। কারো ইয্যত-আবরু নষ্ট করা, কারো পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য জরুরী তাদের আনুগত্যে

ত্রুটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, যা শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায় করত। বিদায় হজের ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের ইয্যত-আবরুকে তাদের রক্তের সমান সম্মানযোগ্য ও সংরক্ষণযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন। তৃতীয়তঃ পৃথিবীর সংস্কার সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িও না। অর্থাৎ পৃথিবীর বাহ্যিক সংস্কার হল, প্রত্যেকটি বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা, এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বস্তুতঃ তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর আভ্যন্তরীণ সংস্কার হল আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তা তাঁর নির্দেশাবলী পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অনর্থ এসব নীতি পরিত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায় এসব নীতির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল। ফলে পৃথিবীতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সব রকম অনর্থ বিরাজমান ছিল। তাই তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ড সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করবে। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাক।

অতঃপর বলা হয়েছেঃ যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর, তবে তোমাদের জন্য উত্তম। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যদি তোমরা অবৈধ কাজ-কর্ম থেকে বিরত হও, তবে এতেই তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। দ্বীন ও আখেরাতের মঙ্গলের বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এটি আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথেই সর্বতোভাবে জড়িত। দুনিয়ার মঙ্গল এ জন্য যে, যখন সবাই জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওজনে এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হবে। এরপর তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্য উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত স্মরণ করানো হয়েছে যে, তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন। অথবা তোমরা ধন-সম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐশ্বর্য্য দান করে তোমাদের স্বনির্ভর করে দিয়েছেন। অতঃপর ভীতি প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছেঃ পূর্ববর্তী অনর্থ সৃষ্টিকারী জাতিসমূহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর- কওমে নূহ্, 'আদ, সামূদ ও কওমে লূতের উপর কি ভীষণ আযাব এসেছে। তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ কর। শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের দাওয়াতের পর তার সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু সংখ্যক মুসলিম হয়, এবং কিছু সংখ্যক কাফেরই থেকে যায়। কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় দল একই রূপ আরাম-আয়েশে দিনাতিপাত করতে থাকে। এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাফের হওয়া অপরাধ হলে অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছেঃ তাড়াহুড়া কিসের? আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাগুণে অপরাধীদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, তখন

সত্য ও মিথ্যার মীমাংসা করে দেয়া হয়। তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। তোমরা যদি কুফর থেকে বিরত না হও, তবে অতি সত্বর কাফেরদের উপর চূড়ান্ত আযাব নাযিল হয়ে যাবে। জাতির অহংকারী সর্দারদের সাথে এ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর যখন শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম বুঝতে পারলেন যে, তারা কোন কিছুতেই প্রভাবান্বিত হচ্ছে না, তখন তাদের সাথে কথা-বার্তা ছেড়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দো'আ করলেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে সত্যভাবে ফয়সালা করে দিন, এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম স্বীয় সম্প্রদায়ের কাফেরদেরকে ধ্বংস করার দো'আ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ দো'আ কবূল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের আযাবকে এখানে ভূমিকম্প বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে, তাদেরকে ছায়াদিবসের আযাব পাকড়াও করেছে। [সূরা আশ-শু'আরা: ১৮৯] 'ছায়া দিবসের' অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর ঘন কাল মেঘের ছায়া পতিত হয়। তারা এর নীচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই তাদের উপর প্রস্তর অথবা অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলেনঃ শু'আইব 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেয়া হয়, যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমন কি পানিতেও তাদের জন্য শান্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করে দেখল সেখনে আরো বেশী গরম। অতঃপর অস্থির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হল। সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা একটি ঘন কাল মেঘ পাঠিয়ে দিলেন যার নীচে শীতল বাতাস বইছিল। তারা সবাই গরমে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নিচে এসে ভিড় করল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হল এবং ভূমিকম্পও এল। ফলে তারা সবাই ভস্মস্তূপে পরিণত হল। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার আযাব উভয়টিই আসে। [তাবারী, ৬/৯/৪; আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস পৃ. ২৯২-২৯৩]

স্বজাতির উপর আযাব আসতে দেখে শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। জাতির চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে শু'আইব 'আলাইহিস্ সালাম বদদো'আ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু যখন আযাব এসে গেল তখন নবীসুলভ দয়ার কারণে তার অন্তর ব্যথিত হল। তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে বললেনঃ আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাংখায় কোন ত্রুটি করিনি; কিন্তু আমি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি? [এ জাতির বিস্তারিত ঘটনা ও পরিণতি জানার জন্য দেখুন, ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১/৪৩৯]

বারতম রুকূ'

وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّبِىٍّ إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا
بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾

৯৪. আর আমরা কোন জনপদে নবী পাঠালেই সেখানকার অধিবাসীদেরকে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা আক্রান্ত করি, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে(১)।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا۟
وَّقَالُوا۟ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَٰهُم
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

৯৫. তারপর আমরা অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি। অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, 'আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করেছে।' অতঃপর হঠাৎ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করি, এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধিও করতে পারে না(২)।

---

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নূহ্ 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায় এবং 'আদ' ও 'সামূদ জাতিকে যেসব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা শুধুমাত্র তাদের সাথেই এককভাবে সম্পৃক্ত নয়; বরং সকল জাতির জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। কুরাইশ কাফেরদের জন্যও প্রযোজ্য। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন স্বীয় রীতি অনুযায়ী দুনিয়ার বিভ্রান্ত জাতি-সম্প্রদায়ের সংশোধন ও কল্যাণ সাধনকল্পে যেসব নবী-রাসূল প্রেরণ করেন তাদের আদেশ-উপদেশের প্রতি যারা মনোনিবেশ করে না প্রথমে তাদেরকে পার্থিব বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়, যাতে এই বিপদাপদের চাপে আল্লাহ্র দিকে মনোযোগী হতে পারে। তাঁরই দিকে ফিরে আসতে পারে, নবী-রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করা থেকে বিরত হয়। [তাবারী; সা'দী]

(২) আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে দু'ধরণের পরীক্ষা নিয়েছেন। প্রথম পরীক্ষাটি নেয়া হয়েছে তাদেরকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে অকৃতকার্য হয়, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেয়া হয় দারিদ্র, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং তা অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দুঃখ কষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং এভাবে যেন আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে। কিন্তু কর্মবিমুখ, শৈথিল্য পরায়ণের দল তাতেও সতর্ক হয়নি; বরং বলতে শুরু করে দেয় যে, এটা কোন নতুন বিষয় নয়। সৎ কিংবা

৯৬. আর যদি সে সব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম(১), কিন্তু তারা

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ
كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

অসৎ কর্মের পরিণতিও নয়; বরং প্রাকৃতিক নিয়মই তাই- কখনো সুখ, কখনো দুঃখ, কখনো রোগ, কখনো স্বাস্থ্য, কখনো দারিদ্র্য, কখনো স্বচ্ছলতা এমনই হয়ে থাকে। আমাদের পিতা-পিতামহ প্রমুখ পূর্ব-পুরুষদেরও এমনি সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এতে করে তারা তখনই নিপতিত হলো আকস্মিক আযাবের মধ্যে। অর্থাৎ তারা যখন উভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়ে গেল এবং সতর্ক হল না, তখন আমি তাদেরকে আকস্মিক আযাবের মাধ্যমে ধরে ফেল্‌লাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন খবরই ছিল না। [বাগভী; কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(১) বরকতের শাব্দিক অর্থ প্রবৃদ্ধি। আর বরকতের মূল হচ্ছে, কোন কিছু নিয়মিত থাকা। [বাগভী] 'আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকত খুলে দেয়া' বলতে উদ্দেশ্য হল সব রকম কল্যাণ সবদিক থেকে খুলে দেয়া। অর্থাৎ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হত আর যমীন থেকে যে কোন বস্তু তাদের মনমত উৎপাদিত হত এবং অতঃপর সেসব বস্তু দ্বারা তাদের লাভবান হওয়ার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেয়া হত। [ফাতহুল কাদীর] তাতে তাদেরকে এমন কোন চিন্তা-ভাবনা কিংবা টানাপোড়নের সম্মুখীন হতে হত না যার দরুন বড় বড় নেয়ামতও পঙ্কিলতাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের প্রতিটি বিষয়ে বরকত বা প্রবৃদ্ধি ঘটত।

পৃথিবীতে বরকতের বিকাশ ঘটে দু'রকমে। কখনো মুল বস্তুটি প্রকৃতভাবেই বেড়ে যায়। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযাসমূহের মধ্যে রয়েছে একটা সাধারণ পাত্রের পানি দ্বারা গোটা কাফেলার পরিতৃপ্ত হওয়া। কিংবা সামান্য খাদ্য দ্রব্যে বিরাট সমাবেশের পেটভরে খাওয়া যা সঠিক ও বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। আবার কোন কোন সময় মূল বস্তুতে বাহ্যতঃ কোন বরকত বা প্রবৃদ্ধি যদিও হয় না, পরিমাণে যা ছিল তাই থেকে যায় কিন্তু তার দ্বারা এতবেশী কাজ হয় যা এমন দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বস্তুর দ্বারাও সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাধারণভাবেও দেখা যায় যে, কোন একটা পাত্র কাপড়-চোপড় কিংবা ঘরদুয়ার অথবা ঘরের অন্য কোন আসবাবপত্র এমন বরকতময় হয় যে মানুষ তাতে আজীবন উপকৃত হওয়ার পরেও তা তেমনি বিদ্যমান থেকে যায়। পক্ষান্তরে অনেক জিনিষ তৈরী করার সময়ই ভেঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা অটুট থাকলেও তার দ্বারা উপকার লাভের কোন সুযোগ আসে না। অথবা উপকারে আসলেও তাতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। এই বরকত মানুষের ধন সম্পদে হতে পারে, মন মস্তিস্কে হতে পারে আবার কাজ কর্মেও হতে পারে।

মিথ্যারোপ করেছিল; কাজেই আমরা তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছি।

৯৭. তবে কি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের উপর রাতে আসবে, যখন তারা থাকবে গভীর ঘুমে?

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰٓ أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا
بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ﴿٩٧﴾

৯৮. নাকি জনপদের অধিবাসীরা নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আমাদের শাস্তি তাদের উপর আসবে দিনের বেলা, যখন তারা খেলাধুলায় মেতে থাকবে?

أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰٓ أَنْ يَّأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى
وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩٨﴾

৯৯. তারা কি আল্লাহ্‌র কৌশল থেকেও নিরাপদ হয়ে গেছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহ্‌র কৌশলকে নিরাপদ মনে করে না(১)।

أَفَأَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ إِلَّا
الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٩٩﴾

কোন কোন সময় মাত্র এক গ্রাস খাদ্যও মানুষের জন্য পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের কারণ হয়। আবার কোন কোন সময় অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য বা ঔষধও কোন কাজে আসে না। তেমনিভাবে কোন সময়ের মধ্যে বরকত হলে মাত্র এক ঘন্টা সময়ে এত অধিক কাজ করা যায়, যা অন্য সময় চার ঘন্টায়ও করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক দিয়ে সম্পদ বা সময় বাড়ে না সত্য, কিন্তু এমনি বরকত তাতে প্রকাশ পায় যাতে কাজ হয় বহুগুণ বেশী।

(১) মূলে 'মকর' শব্দ ব্যবহার হয়েছে, আরবীতে এর মূল অর্থ হচ্ছে, ধোকাগ্রস্ত করা [ফাতহুল কাদীর] বা গোপনে গোপনে কোন চেষ্টা তদবীর করা। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমনভাবে গুটি চালানো, যার ফলে তার উপর চরম আঘাত না আসা পর্যন্ত সে জানতেই পারে না যে, তার উপর এক মহা বিপদ আসন্ন। বরং বাইরের অবস্থা দেখে সে একথাই মনে করতে থাকে যে, সব কিছু ঠিকমত চলছে। [আল-মানার ১১/২৭৪]

তবে এ আয়াতে যে 'মকর' বা কৌশল অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে, তা আল্লাহর এক গুণ। তিনি তার বিরোধীদের পাকড়াও করার জন্য যে কৌশলই অবলম্বন করেন তা অবশ্যই প্রশংসাপূর্ণ গুণ হিসেবে বিবেচিত হবে। কারণ তারাও আল্লাহর সাথে অনুরূপ করে বলে মনে করে থাকে। তিনি যে রকম তাঁর গুণও সে রকম। তাঁর এ গুণে গুণান্বিত হবার ধরণ সম্পর্কে কেউ জানতে পারে না। এ জাতীয়

তেরতম রুকূ‘

أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

১০০. কোন দেশের জনগনের পর যারা ঐ দেশের উত্তরাধিকারী হয় তাদের কাছে এটা কি প্রতীয়মান হয়নি যে, আমরা ইচ্ছে করলে তাদের পাপের দরুন তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি⁽¹⁾? আর আমরা তাদের হৃদয় মোহর করে দেব, ফলে তারা শুনবে না⁽²⁾ ।

আলোচনা সূরা বাকারায় বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে ।[আরও দেখুন, সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ]

(১) আয়াতে يَهْدِ অর্থ চিহ্নিতকরণ, প্রতীয়মান হওয়া এবং বাতলে দেয়া । এখানে এর কর্তা হল সে সমস্ত ঘটনাবলী যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে । অর্থাৎ বর্তমান যুগের লোকেরা যারা অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসের পরে তাদের ভূ-সম্পত্তি ও ঘর-বাড়ীর উত্তরাধিকারী হয়েছে কিংবা পরে হবে, তাদেরকে শিক্ষণীয় সেসব অতীত ঘটনাবলী একথা বাতলে দেয়নি যে, কুফরী ও অস্বীকৃতি এবং আল্লাহ্‌র বিধানের বিরোধিতার পরিণতিতে যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষেরা (অর্থাৎ বিগত জাতিসমূহ) ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হয়ে গেছে । তেমনিভাবে তারাও যদি অনুরূপ অপরাধে লিপ্ত থাকে তাহলে তাদের উপরও আল্লাহ্‌র তা‘আলার আযাব ও গযব আসতে পারে । [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] আল্লাহ্ তা‘আলা কুরআনের স্থানে স্থানে এ বিষয়টি বার বার উল্লেখ করে মানুষকে পূর্ববর্তী জাতিদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন । যেমনঃ সূরা তোয়াহাঃ ১২৮, সুরা আস্ সাজদাহঃ ২৬, সূরা ইবরাহীমঃ ৪৫, সূরা মারইয়ামঃ ৯৮, সূরা আল-আন‘আমঃ ৬, ১০, সূরা আল-আহকাফঃ ২৫-২৭, সূরা সাবাঃ ৪৫, সূরা আল-মুলকঃ ১৮, সূরা আল-হাজঃ ৪৫-৪৬ ।

(২) অর্থাৎ এরা অতীত ঘটনাবলী থেকেও কোন রকম শিক্ষা গ্রহণ করে না । ফলে আল্লাহ্‌র গযবের দরুন তাদের অন্তরে মোহর এঁটে যায়, তারা তখন কিছুই শুনতে পায় না । হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘কোন লোক যখন প্রথমবার পাপ কাজ করে তখন তার অন্তরে মালিন্যের একটা বিন্দু লেগে যায় । দ্বিতীয়বার পাপ করলে দ্বিতীয় বিন্দু লাগে আর তৃতীয়বার পাপ করলে তৃতীয় বিন্দুটি লেগে যায় । এমনকি সে যদি অনবরত পাপের পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং তাওবাহ্ না করে তাহলে এই কালি-বিন্দু তার সমগ্র অন্তরকে ঘিরে ফেলে ।’ [দেখুন- ইবন মাজাহ্ঃ ৪২৪৪] তখন মানুষের অন্তরে ভাল-মন্দকে চেনার এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা যে স্বাভাবিক যোগ্যতাটি দিয়ে রেখেছেন, তা হয় নিঃশেষিত না হয় পরাভূত হয়ে যায় । আর তখন তার ফল দাঁড়ায় এই যে,

১০১. এসব জনপদের কিছু বিবরণ আমরা আপনার কাছে বর্ণনা করছি, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ তো স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিলেন; কিন্তু পূর্বে তারা যাতে মিথ্যারোপ করেছিল, তাতে তারা ঈমান আনার ছিল না(১), এভাবে আল্লাহ্ কাফেরদের হৃদয় মোহর করে দেন।

تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾

১০২. আর আমরা তাদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাইনি; বরং আমরা তাদের অধিকাংশকে তো ফাসেকই পেয়েছি(২)।

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ ۚ وَاِنْ وَّجَدْنَاۤ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ﴿١٠٢﴾

সে ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল এবং ইষ্টকে অনিষ্ট ও অনিষ্টকে ইষ্ট বলে ধারণা করতে আরম্ভ করে। এ অবস্থানটিকেই কুরআনে رأن القلوب অর্থাৎ 'অন্তরের মরচে' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এ অবস্থার সর্বশেষ পরিণতিকেই আলোচ্য আয়াতে এবং আরো বহু আয়াতে 'মোহর এঁটে দেয়া হয়' বলা হয়েছে। এ অবস্থায় উপণীত হলে সত্যসেখানে প্রবেশের সুযোগ পায় না, কল্যাণের কোন স্থান সেখানে থাকে না, যা তাদের উপকারে আসবে এমন কিছু শুনতে পায় না। শুধু সেটাই শুনতে পায় যা তাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগে। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ তাদের অন্তর মানবিক বুদ্ধিবৃত্তির এমন একটি মনস্তাত্বিক নিয়মের আওতাধীন হয়ে যায়, যার দৃষ্টিতে একবার জাহেলী বিদ্বেষ বা হীন ব্যক্তি স্বার্থের ভিত্তিতে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার পর মানুষ নিজের জিদ ও হঠকারিতার শৃংখলে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে যেতে থাকে যে, তারপর কোন প্রকার যুক্তি-প্রমাণ, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা, নিরীক্ষাই সত্যকে গ্রহণ করার জন্য তার মনের দুয়ার খুলে দেয় না। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এর অর্থ, যদি আমরা তাদেরকে আবার জীবিতও করতাম, তারপরও তারা ঈমান আনত না। কারণ কুফরী ও শির্ক করা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। [ফাতহুল কাদীর] কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে উদ্দেশ্য এই যে, তারা পূর্বে যখন আমি তাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, তখনই মিথ্যারোপ করেছিল। আল্লাহকে রব ও রাসূলদের মেনে ঈমান আনতে তখনও স্বতঃস্ফুর্তভাবে চায়নি। বরং তারা অনিচ্ছাসত্বেই ঈমানের কথা বলেছিল। সুতরাং যাতে তারা পূর্বে ঈমান আনতে অস্বীকার করেছিল তাতে তারা কখনও ঈমান আনবে না। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

(২) অর্থাৎ কোন ধরনের অংগীকার পালনের পরোয়াই তাদের নেই। আল্লাহর পালিত বান্দা হবার কারণে জন্মগতভাবে প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর সাথে যে অংগীকারে

১০৩. তারপর আমরা তাদের পরে মূসাকে আমাদের নিদর্শনসহ ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছি; কিন্তু তারা সেগুলোর সাথে অত্যাচার করেছে(১)। সুতরাং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য করুন।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৪. আর মূসা বললেন, 'হে ফির'আউন(২)!

وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ

আবদ্ধ, তা প্রতিপালনের কোন পরোয়াই তাদের নেই। তারা সামাজিক অংগীকার পালনেরও কোন পরোয়া করে না, মানব সমাজের একজন সদস্য হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তি যার সাথে একটি সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ অন্যদিকে নিজের বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তগুলোতে অথবা কোন সদিচ্ছা ও মহৎ বাসনা পোষণের মুহূর্তে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর সাথে যে অংগীকারে আবদ্ধ হয়, তাও তারা পালন করে না। এ ধরনের অংগীকার ভঙ্গ করাকে এখানে ফাসেকী বলা হয়েছে। [সা'দী] কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে অঙ্গীকার বলে সে অঙ্গীকারই উদ্দেশ্য যা আল্লাহ্ তা'আলা আদমের পিঠে মানুষ থেকে নিয়েছিলেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

(১) আল্লাহ্‌র আয়াত বা নিদর্শনের প্রতি যুলুম করার অর্থ হল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার আয়াত বা নিদর্শনের কোন মর্যাদা বুঝেনি। সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরী অবলম্বন করেছে। কারণ যুলুমের প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে- কোন বস্তু বা বিষয়কে তার সঠিক স্থান কিংবা সঠিক সময়ের বিপরীতে ব্যবহার করা। সে হিসেবে ফির'আউন মূসা আলাইহিস সালাম যে সমস্ত নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন সেগুলোর সাথে যুলুম করেছিল। অন্য আয়াতে সে যুলুমের ব্যাখ্যা এসেছে, "আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে নিশ্চিত সত্য বলে গ্রহণ করেছিল" [সূরা আন-নামল:১৪] সুতরাং তারা সত্য জেনেও সেগুলোকে যুলুমবশতঃ অস্বীকার করেছিল। [আদওয়াউল বায়ান]

(২) মিসরীয় শাসকরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর প্রত্যেকটি শাসক নিজেদের জন্য "ফির'আউন" (ফারাও) উপাধি গ্রহণ করে দেশবাসীর সামনে একথা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে যে, আমি-ই তোমাদের প্রধান রব বা মহাদেব। পরবর্তীতে ফির'আউন শব্দটি অহংকারী দাম্ভিক অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। কেউ যদি অহংকারী ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে তখন বলা হয়, تَفَرْعَنَ فُلَانٌ বা অমুক দাম্ভিকতা, অহংকার ও সীমালঙ্ঘনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। [কাশশাফ] কোন কোন মুফাসসির বলেন, প্রত্যেক চক্রান্তকারী ও ষড়যন্ত্রকারীকে تَفَرْعَنَ বলা হয়। [ফাতহুল কাদীর]

নিশ্চয় আমি সৃষ্টিকুলের রবের কাছ থেকে প্রেরিত।’

الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿١٠٤﴾

১০৫. ‘এটা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া বলব না। তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আমি তোমাদের কাছে এসেছি, কাজেই বনী ইস্‌রাঈলকে তুমি আমার সাথে পাঠিয়ে দাও⁽¹⁾।’

حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ لَّآ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ؕ﴿١٠٥﴾

১০৬. ফির‘আউন বলল, ‘যদি তুমি কোন নিদর্শন এনে থাক, তবে তুমি সত্যবাদী হলে তা পেশ কর।’

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৭. অতঃপর মূসা তাঁর হাতের লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং সাথে সাথেই তা এক অজগর সাপে পরিণত হল⁽²⁾।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۚ ۖ﴿١٠٧﴾

---

(১) মুসা আলাইহিস সালামকে দু’টি জিনিসের দাওয়াত সহকারে ফেরাউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এক, আল্লাহর বন্দেগী তথা ইসলাম গ্রহণ করো। দুই, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়, যারা আগে থেকেই মুসলিম ছিল, তাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। কুরআনের কোথাও এ দু’টি দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এক সাথে আবার কোথাও স্থান-কাল বিশেষে আলাদা আলাদাভাবে এদের উল্লেখ এসেছে।

(২) সারকথা, আমার কথার উপর তোমাদের বিশ্বাস এজন্য স্থাপন করা কর্তব্য যে, আমার সত্যতা তোমাদের সবার সামনে ভাস্কর; আমি কখনো মিথ্যা বলিওনি বলতে পারিও না। কারণ নবী-রাসূলগণ খেয়ানত ও যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত নিষ্পাপ। তাছাড়া শুধুমাত্র তাই নয় যে, আমি কখনো মিথ্যা বলিনি; বরং আমার দাবীর সপক্ষে আমার মু‘জিযাসমূহ প্রমাণ হিসাবে রয়েছে। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে তোমরা আমার কথা শুন এবং আমার কথা মান। বনী-ইস্‌রাঈলকে অন্যায় দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমার সাথে দিয়ে দাও। কিন্তু ফির‘আউন অন্য কোন কথাই লক্ষ্য করল না; মু‘জিযা দেখবার দাবী করতে লাগল এবং বললঃ বাস্তবিকই যদি তুমি কোন মু‘জিযা নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থাপন কর যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক। মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম তার দাবী মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন, আর অমনি তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে গেল। ‘সু‘বান’ বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। আর তার গুণবাচক ‘মুবীন’ শব্দ উল্লেখ করে বলে দেয়া

১০৮. এবং তিনি তাঁর হাত বের করলেন(১) আর সাথে সাথেই তা দর্শকদের কাছে শুভ্র উজ্জ্বল দেখাতে লাগল(২) ।

وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيۡضَآءُ لِلنّٰظِرِيۡنَ ﴿١٠٨﴾

চৌদ্দতম রুকূ‘

১০৯. ফির‘আউন সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, ‘এ তো একজন সুদক্ষ জাদুকর(৩),’

قَالَ الۡمَلَاُ مِنۡ قَوۡمِ فِرۡعَوۡنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيۡمٌ ۙ﴿١٠٩﴾

হয়েছে যে, সে লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোন ঘটনা ছিল না যা অন্ধকারে কিংবা পর্দার আড়ালে ঘটে থাকবে যা কেউ দেখে থাকবে, কেউ দেখবে না। সাধারণতঃ যা জাদুকরদের বেলায় ঘটে থাকে। বরং এ ঘটনাটি সংঘটিত হল প্রকাশ্য দরবারে সবার সামনে।

(১) نزع অর্থ হচ্ছে কোন একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভেতর থেকে কিছুটা বল প্রয়োগের মাধ্যমে বের করা। অর্থাৎ নিজের হাতটিকে টেনে বের করলেন। এখানে কিসের ভেতর থেকে বের করলেন তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে দু’টি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এক স্থানে এসেছে স্বীয় হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচ থেকে অর্থাৎ কখনো গলাবন্ধর ভিতরে ঢুকিয়ে তা বের করলে আবার কখনো বগল-তলে দাবিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলে এ মু‘জিযা প্রকাশ পেত অর্থাৎ সে হাতটি দর্শকদের সামনে প্রদীপ্ত হতে থাকত।

(২) তখন ফির‘আউনের দাবীতে মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম দু’টি মু‘জিযা প্রদর্শন করেছিলেন। একটি হল লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া আর অপরটি হল হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচে দাবিয়ে বের করে আনলে তার প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠা। প্রথম মু‘জিযাটি ছিল বিরোধীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য আর দ্বিতীয়টি তাদেরকে আকৃষ্ট করে আনার উদ্দেশ্যে। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, মূসা ‘আলাইহিস্ সালামের শিক্ষায় হেদায়াতের জ্যোতি রয়েছে আর সেটির অনুসরণ ছিল কল্যাণের কারণ।

(৩) ملأ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোন সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃবর্গকে বুঝানোর জন্য। অর্থ হচ্ছে, ফির‘আউন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এসব মু‘জিযা দেখে তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বললঃ এ যে বড় পারদর্শী জাদুকর। তার কারণ প্রত্যেকের চিন্তা তার নিজ যোগ্যতা অনুসারেই হয়ে থাকে। সে হতভাগারা আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কুদরাত ও মহিমা সম্পর্কে কি বুঝবে, যারা জীবনভর ফির‘আউনকে ‘রব’ আর জাদুকরদেরকে নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করেছে এবং জাদুকরদের ভোজবাজীই দেখে এসেছে। কাজেই তারা এহেন বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পর এছাড়া আর কিইবা বলতে পারত যে, এটা একটা মহাজাদু। কিন্তু তারাও এখানে ساحر এর সাথে عليم শব্দটি যোগ করে একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, মূসা ‘আলাইহিস্ সালামের মু‘জিযা সম্পর্কে তাদের মনেও এ অনুভূতি জন্মেছিল যে, এ কাজটি সাধারণ জাদুকরদের

১১০. 'এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়, এখন তোমরা কি পরামর্শ দাও(১)?'

يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿١١٠﴾

১১১. তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও(২),'

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۙ﴿١١١﴾

কাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। এজন্যই স্বীকার করে নিয়েছে যে, তিনি বড়ই বিজ্ঞ জাদুকর।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বযুগেই নবী- রাসূলগণের মু'জিযাসমূহকে এমনি ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যে, দর্শকবৃন্দ যদি সামান্যও চিন্তা করে আর হঠকারীতা অবলম্বন না করে তাহলে মু'জিযা ও জাদুর মাঝে যে পার্থক্য তা নিজেরাই বুঝতে পারে। জাদুকররা সাধারণতঃ অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকে। পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা যত বেশী হবে তাদের জাদুও তত বেশী কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হল নবী-রাসূলগণের সহজাত অভ্যাস। তাছাড়া মু'জিযা সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার কুদরাতের কাজ। তাই কুরআনুল কারীমে এ বিষয়টিকে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন ﴿وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى﴾ "এবং আল্লাহ্ তা'আলাই সে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন"। [সূরা আল-আনফাল:১৭]

সারমর্ম এই যে, ফির'আউনের সম্প্রদায়ও মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মু'জিযাকে নিজেদের জাদুকরদের কার্যকলাপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্রই মনে করেছিল। সেজন্যই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, এ তো বড় বিজ্ঞ জাদুকর, সাধারণ জাদুকররা যে এমন কাজ দেখাতে পারে না।

(১) এ আয়াতগুলোতে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের অবশিষ্ট কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে যে, ফির'আউন যখন মূসা 'আলাইহিস্ সালামের প্রকৃষ্ট মু'জিযা দেখল; লাঠি মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা সাপে পরিণত হয়ে গেল এবং আবার যখন সেটাকে হাতে ধরলেন, তখন পুনরায় তা লাঠি হয়ে গেল। আর হাতকে যখন গলাবন্ধের ভিতরে দাবিয়ে বের করলেন তখন তা প্রদীপ্ত হয়ে চকমক করতে লাগল। এ আসমানী নিদর্শনের যৌক্তিক দাবী ছিল মূসা 'আলাইহিস্ সালামের উপর ঈমান নিয়ে আসা। কিন্তু ভ্রান্তবাদীরা যেমন সত্যকে গোপন করার জন্য এবং তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বাস্তব ও সঠিক বিষয়ের উপর মিথ্যার শিরোনাম লাগিয়ে থাকে, ফির'আউন এবং তার সম্প্রদায়ের নেতারাও তাই করল। বললঃ তিনি বড় বিজ্ঞ জাদুকর এবং তার উদ্দেশ্য হল তোমাদের দেশ দখল করে নিয়ে তোমাদেরকে বের করে দেয়া। কাজেই তোমরাই বল এখন কি করা উচিত?

(২) সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, ইনি যদি জাদুকর হয়ে থাকেন এবং জাদুর দ্বারাই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তার মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে

১১২. 'যেন তারা তোমার কাছে প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকর উপস্থিত করে ।'

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾

১১৩. জাদুকররা ফির'আউনের কাছে এসে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো(১)?'

وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا۟ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿١١٣﴾

১১৪. সে বলল, 'হ্যাঁ এবং তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত হবে ।'

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾

মোটেই কঠিন নয় । আমাদের দেশেও বহু বড় বড় অভিজ্ঞ জাদুকর রয়েছে; যারা তাকে জাদুর দ্বারা পরাভূত করে দেবে । কাজেই কিছু সৈন্য-সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন । তারা সব শহর থেকে জাদুকরদেরকে ডেকে নিয়ে আসবে । তখন জাদু মন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল এবং সাধারণ লোকদের উপর জাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল । আর মূসা 'আলাইহিস্ সালামকেও লাঠি এবং উজ্জ্বল হাতের মু'জিযা এজন্যই দেয়া হয়েছিল যাতে জাদুকরদের সাথে তার প্রতিদ্বন্দিতা হয় এবং মু'জিযার মোকাবেলায় জাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে । আল্লাহ্ তা'আলার রীতিও ছিল তাই । প্রত্যেক যুগের নবী-রাসূলকেই তিনি সে যুগের জনগণের কাছে বহুল প্রচলিত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত মু'জিযা দান করেছেন । ঈসা আলাইহিস্সালামের যামানায় চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের চরম শিখরে ছিল, সেহেতু তাকে মু'জিযা দেয়া হয়েছিল জন্মান্ধকে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেয়া এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে সুস্থ করে তোলা । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আরবে অলংকার শাস্ত্র ও বাগ্মীতার চরম উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল । তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় মু'জিযা হল কুরআন, যার মোকাবেলায় গোটা আরব-আজম অসমর্থ হয়ে পড়ে ।

(১) ফির'আউনের জাদুকররা প্রথমে এসেই মজুরী নিয়ে দরকষাকষি করতে শুরু করল । তার কারণ যারা ভ্রান্তবাদী পার্থিব লাভই হল তাদের মূখ্য । কাজেই যেকোন কাজ করার পূর্বে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা লাভের প্রশ্ন । অথচ নবী-রাসূলগণ এবং তাদের যারা নায়েব বা প্রতিনিধি তারা প্রতি পদক্ষেপে ঘোষণা করেনঃ "আমরা যে সত্যের বাণী তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদেরকে পৌঁছে দেই তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান কামনা করি না । বরং আমাদের প্রতিদানের দায়িত্ব শুধু আল্লাহ্র উপরই রয়েছে" । [সূরা আস-শু'আরাঃ ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০] ফির'আউন তাদেরকে বললঃ তোমরা পারিশ্রমিক চাইছ? আমি পারিশ্রমিক তো দেবই আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরকে শাহী দরবারের ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত করে নেব ।

১১৫. তারা বলল, ‘হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করব(১)?’

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ﴿١١٥﴾

১১৬. তিনি বললেন, ‘তোমরাই নিক্ষেপ কর’। যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন তারা লোকদের চোখে জাদু করল, তাদেরকে আতংকিত করল এবং তারা এক বড় রকমের জাদু নিয়ে এল(২)।

قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ﴿١١٦﴾

১১৭. আর আমরা মূসার কাছে ওহী পাঠালাম যে, ‘আপনি আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন’(৩)। সাথে সাথে সেটা তারা

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾

---

(১) অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দিতার জন্য যখন মাঠে গিয়ে সবাই উপস্থিত, তখন জাদুকররা মূসা ‘আলাইহিস্ সালামকে বললঃ হয় আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথম নিক্ষেপ করি। সম্ভবত তারা নিজেদের নিশ্চয়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্যই তা বলেছিল। উদ্দেশ্য যেন এই যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন পরোয়াই নেই, যে ইচ্ছা প্রথমে তার কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করুক। মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিয়ে নিজের মু‘জিযা সম্পর্কে আশ্বস্ততার দরুন প্রথম তাদেরকেই সুযোগ দিলেন। বললেন, “তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর”। কারণ, তাদের কর্মকাণ্ডের পর মু‘জিযা বের হলে সেটা তাদের অন্তরে কঠোরভাবে রেখাপাত করতে বাধ্য হবে। [ইবন কাসীর; সা‘দী]

(২) অর্থাৎ জাদুকররা যখন তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন দর্শকদের নযরবন্দী করে দিয়ে তাদের উপর ভীতি সঞ্চারিত করে দিল এবং মহাজাদু দেখাল। এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের জাদু ছিল এক প্রকার নযরবন্দী যাতে দর্শকদের মনে হতে লাগল যে, এই লাঠি আর দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল তেমনি লাঠি ও দড়ি যা পূর্বে ছিল, সাপ হয়নি। এটা এক রকম সম্মোহনী, যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধাঁধিয়ে দেয়। [ইবন কাসীর] কিন্তু তাই বলে এ কথা প্রতীয়মান হয় না যে, জাদু এ প্রকারেই সীমাবদ্ধ। বরং জাদুর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। প্রত্যেক প্রকার অনুসারে শরী‘আতে তার বিধানও ভিন্ন হয়ে থাকে।

(৩) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা জাদুকরদের বিপরীতে মূসা ‘আলাইহিস্ সালামকে কিভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে বলেনঃ আমি মূসাকে নির্দেশ দিলাম যে, আপনার লাঠিটি মাটিতে ফেলে দিন। তা মাটিতে পড়তেই সবচেয়ে বড়

যে অলীক বস্তু বানিয়েছিল তা গিলে ফেলতে লাগল;

১১৮. ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল তা বাতিল হয়ে গেল।

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾

১১৯. সুতরাং সেখানে তারা পরাভূত হল ও লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল,

فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾

১২০. এবং জাদুকরেরা সিজ্‌দাবনত হল।

وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾

১২১. তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম সৃষ্টিকুলের রবের প্রতি'।

قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾

১২২. 'মূসা ও হারূনের রব।'

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

১২৩. ফির'আউন বলল, 'কি! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগে তোমরা তাতে ঈমান আনলে? এটা তো এক চক্রান্ত; তোমরা এ চক্রান্ত করেছ নগরবাসীদেরকে এখান থেকে বের করে দেয়ার জন্য(১)। সুতরাং

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ
هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ
اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾

সাপ হয়ে সমস্ত সাপগুলোকে গিলে খেতে শুরু করল, যেগুলো জাদুকররা জাদুর দ্বারা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু মূসা 'আলাইহিস্ সালামের লাঠি যখন এক বিরাট আযদাহা বা অজগরের আকার ধারণ করে এল তখন সে সবগুলোকে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেলল।

(১) অর্থাৎ এটা একটা ষড়যন্ত্র যা তোমরা প্রতিদ্বন্দিতার মাঠে আসার পূর্বেই শহরের ভেতরে নিজেদের মধ্যে স্থির করে রেখেছিল। তারপর জাদুকরদেরকে লক্ষ্য করে বললঃ তোমরা কি আমার অনুমতির পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করে ফেললে। অস্বীকৃতিবাচক এই কৈফিয়তটি ছিল হুমকি ও তাম্বীহ্‌স্বরূপ। স্বীয় অনুমতির পূর্বে ঈমান আনার কথা বলে লোকেদেরকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল যে, আমারো কাম্য ছিল যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটি যদি প্রতীয়মান হয়ে যায় তাহলে আমিও তাকে মেনে নেব এবং লোকদেরও মুসলিম হওয়ার জন্য অনুমতি দান করব। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করলে এবং প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে-শুনেই একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেলে।

এই চাতুর্যের মাধ্যমে একদিকে লোকের সামনে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মু'জিযা

তোমরা শীঘ্রই এর পরিণাম জানতে পারবে।

১২৪. ‘অবশ্যই অবশ্যই আমি তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে টুকরো করে ফেলব; তারপর অবশ্যই তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব(১)।’

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٢٤

১২৫. তারা বলল, ‘নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের কাছেই ফিরে যাব;’

قَالُوٓا إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٢٥

১২৬. ‘আর তুমি তো আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছ শুধু এ জন্যে যে, আমরা আমাদের রবের নিদর্শনে ঈমান এনেছি যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। হে আমাদের রব! আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিমরূপে আমাদেরকে মৃত্যু দিন।’

وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ١٢٦

আর জাদুকরদের স্বীকৃতিকে একটা ষড়যন্ত্র সাব্যস্ত করে তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করল। অপরদিকে রাজনৈতিক চালাকীটি করল এই যে, মূসা ‘আলাইহিস্ সালামের কার্যকলাপ এবং জাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ একান্তই একটা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বলল, “তোমরা এই ষড়যন্ত্র এ জন্য করেছ যে তোমরা মিসর দেশের উপর জয়লাভ করে এ দেশের অধিবাসীদেরকে এখান থেকে বহিস্কার করতে চাও”। অথচ মূসা ‘আলাইহিস্ সালামের কার্যকলাপ এবং জাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ ফির‘আউনের পথভ্রষ্টতাকে পরিস্কার করে তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল, জাতি ও জনসাধারনের সাথে যার কোন সম্পর্কই ছিল না।

(১) ফির‘আউন মূল বিষয়টাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার মত চালাকীর পর সবার উপর নিজের আতঙ্ক এবং সরকারের প্রভাব ও ভীতি সঞ্চার করার জন্য জাদুকরদের হুমকি দিতে আরম্ভ করল। প্রথমে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বলল, “তোমাদের যে কি পরিণতি, তোমরা এখনই দেখতে পাবে” অতঃপর তা পরিস্কারভাবে বলল, “আমি তোমাদের সবার বিপরীত দিকের হাত-পা কেটে তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়াব”। বিপরীত দিকের কাটা অর্থ হল ডান হাত, বাম পা। যাতে উভয় পার্শ্বে জখমী হয়ে বেকার হয়ে পড়বে।

পনরতম রুকূ'

১২৭. আর ফির'আউন সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, 'আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে⁽¹⁾ বর্জন করতে দেবেন?' সে বলল, 'শীঘ্রই আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব। আর নিশ্চয় আমরা তাদের উপর শক্তিধর⁽²⁾।'

وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى
وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ
وَاٰلِهَتَكَ ؕ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيٖ
نِسَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قٰهِرُوْنَ ﴿١٢٧﴾

১২৮. মূসা তার সম্প্রদায়কে বললেন, 'আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধর; নিশ্চয় যমীন আল্লাহ্‌রই। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছে তার

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ
اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ ۙ۫ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ
عِبَادِهٖ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٢٨﴾

---

(১) এ কালেমায় দু'টি কেরাআত আছে, (এক) وآلهتك অর্থাৎ আপনার মা'বুদদেরকে। তখন এর অর্থ হবেঃ ফির'আউন নিজে ইলাহ হওয়ার দাবী করলেও তার আরও কিছু মা'বুদ ছিল। তার জাতির নেতা শ্রেণীর লোকেরা বলতে লাগল যে, কিভাবে এরা আপনাকে এবং আপনার মা'বুদদের ইবাদত ত্যাগ করার মত দুঃসাহস দেখাতে পারে? (দুই) وإلاهتك অর্থাৎ আপনার ইবাদতকে। তখন এর অর্থ হবেঃ ফির'আউন আর কোন মা'বুদের ইবাদত করত না, বরং তার জাতির নেতা গোছের লোকেরা তাকে এ বলে উস্কাতে লাগল যে, তাদের কেমন সাহস যে, তারা আপনার ইবাদতকে ত্যাগ করতে পারে? [তাবারী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

(২) ফির'আউনের সভাষদ নেতা গোছের লোকেরা ফির'আউনকে বলল যে, তাহলে কি তুমি মূসা এবং তার সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দেবে, যাতে তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদেরকে পরিহার করে দেশময় দাঙ্গা-ফাসাদ করতে থাকবে? এতে বাধ্য হয়ে ফির'আউন বললঃ তার বিষয়টি আমাদের পক্ষে তেমন চিন্তার বিষয় নয়। আমরা তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নেব যে, তাদের মধ্যে কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করব শুধু কন্যা-সন্তানদের বাঁচতে দেব। যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাদের জাতি পুরুষশূন্য হয়ে পড়বে; থাকবে শুধু নারী আর নারী। আর তারা হবে আমাদের সেবাদাসী। তাছাড়া তাদের উপর তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছেই; যা ইচ্ছা তাই করব। এরা আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

ওয়ারিশ বানান। আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই(১)।'

১২৯. তারা বলল, 'আপনি আমাদের কাছে আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনি আসার পরও।' তিনি বললেন, 'শীঘ্রই তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে যমীনে স্থলাভিষিক্ত করবেন, তারপর তোমরা কি কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন।'

قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبۡلِ أَن تَأۡتِيَنَا وَمِنۢ بَعۡدِ مَا جِئۡتَنَاۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُّهۡلِكَ عَدُوَّكُمۡ وَيَسۡتَخۡلِفَكُمۡ فِي الۡأَرۡضِ فَيَنظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَلُونَ ﴿١٢٩﴾

ষোলতম রুকূ'

১৩০. আর অবশ্যই আমরা ফির'আউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَلَقَدۡ أَخَذۡنَآ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ بِالسِّنِينَ وَنَقۡصٍ مِّنَ الثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾

১৩১. অতঃপর যখন তাদের কাছে কোন কল্যাণ আসত, তখন তারা বলত, 'এটা আমাদের পাওনা।' আর যখন কোন অকল্যাণ পৌঁছত তখন তারা মূসা ও তার সাথীদেরকে

فَإِذَا جَآءَتۡهُمُ الۡحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِۦۖ وَإِن تُصِبۡهُمۡ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓۗ أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمۡ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿١٣١﴾

---

(১) ফির'আউন মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে বনী-ইস্রাঈলের ছেলেদেরকে হত্যা করে মেয়েদেরকে জীবিত রাখার আইন তৈরী করে দিল। এতে বনী-ইস্রাঈলরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের জন্মের পূর্বে ফির'আউন তাদের উপর যে আযাব চাপিয়ে দিয়েছিল তা আবার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন তা উপলব্ধি করলেন, তখন একান্তই রাসূলজনোচিত সোহাগ ও দর্শনানুযায়ী সে বিপদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাদেরকে দু'টি বিষয় শিক্ষাদান করলেন। (এক) শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা এবং (দুই) কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্য ধারণ। সেই সঙ্গে একথাও বাতলে দিলেন যে, এই ব্যবস্থা যদি অবলম্বন করতে পার, তাহলে এ দেশ তোমাদের, তোমরাই জয়ী হবে। আর একথা নিশ্চিত যে, শেষ পর্যন্ত মুত্তাকীরাই কৃতকার্যতা লাভ করে থাকে।

অলক্ষুণে(১) গণ্য করত । সাবধান! তাদের অকল্যাণ তো কেবল আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে; কিন্তু তাদের অনেকেই জানে না ।

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. আর তারা বলত, আমাদেরকে জাদু করার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের কাছে পেশ কর না কেন, আমরা তোমার উপর ঈমান আনব না ।'

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. অতঃপর আমরা তাদের উপর তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত বিস্তারিত নিদর্শন হিসেবে প্রেরণ করি । এরপরও তারা অহংকার করল । আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়(২) ।

---

(১) কুলক্ষণ নেয়া কাফের মুশরিকদেরই কাজ । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কুলক্ষণ নেয়া শির্ক' । [মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৮৯] যুগে যুগে মুশরিকরা ঈমানদারদেরকে কুলক্ষণে, অপয়া ইত্যাদি বলে অভিহিত করত ।

(২) ফির'আউনের জাদুকরদের সাথে সংঘটিত সে ঐতিহাসিক ঘটনার পরও মূসা 'আলাইহিস্ সালাম দীর্ঘ দিন যাবৎ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ্‌র বাণী শুনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে আহ্বান করতে থাকেন । এ সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালামকে নয়টি নিদর্শন দান করেছিলেন । এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফির'আউনের সম্প্রদায়কে সতর্ক করে সত্য পথে আনা । আলোচ্য আয়াতে এই নয়টি নিদর্শন সম্পর্কেই বলা হয়েছে ।
এই নয়টি নিদর্শনের মধ্যে প্রথম দু'টি অর্থাৎ লাঠির সাপে পরিণত হওয়া এবং হাতের শুভ্রতা ফির'আউনের দরবারে প্রকাশিত হয় । আর এগুলোর মাধ্যমেই জাদুকরদের বিরুদ্ধে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম জয়লাভ করেন । তারপরের একটি নিদর্শন যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে তা ছিল ফির'আউনের সম্প্রদায়ের হঠকারিতা ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন । যাতে তাদের ক্ষেতের ফসল এবং বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল । ফলে এরা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভের দো'আ করায় । কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় নিজেদের ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলতে শুরু করে যে, এই দুর্ভিক্ষ তো মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সঙ্গী-সাথীদের অলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল ।

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيۡهِمُ ٱلرِّجۡزُ قَالُواْ يَٰمُوسَى ٱدۡعُ لَنَا
رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَۖ لَئِن كَشَفۡتَ عَنَّا
ٱلرِّجۡزَ لَنُؤۡمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرۡسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ ١٣٤

১৩৪. আর যখন তাদের উপর শাস্তি আসত তারা বলত, ‘হে মূসা! তুমি তোমার রবের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তোমার সাথে তিনি যে অংগীকার করেছেন সে অনুযায়ী; যদি তুমি আমাদের থেকে শাস্তি দূর করে দিতে পার তবে আমরা তো তোমার উপর ঈমান আনবই এবং বনী ইস্‌রাঈলকেও তোমার সাথে অবশ্যই যেতে দেব ।’

فَلَمَّا كَشَفۡنَا عَنۡهُمُ ٱلرِّجۡزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم
بَٰلِغُوهُ إِذَا هُمۡ يَنكُثُونَ ١٣٥

১৩৫. আমরা যখনই তাদের উপর থেকে শাস্তি(১) দূর করে দিতাম এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অংগীকার ভংগ করত ।

আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়েছে, তা হল আমাদের সুকৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি । এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য । তারপর আল্লাহ্ তা‘আলা মূসা ‘আলাইহিস্ সালামকে আরো ছয়টি এমন নিদর্শন দেন যার উদ্দেশ্য ছিল ফির‘আউনের সম্প্রদায়কে সৎপথে নিয়ে আসা । আল্লাহ্ বলেনঃ অতঃপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি তুফান, পঙ্গপাল, ঘুন পোকা, ব্যাঙ এবং রক্ত । এতে ফির‘আউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ রকমের আযাবের কথা আলোচিত হয়েছে । এসব আযাবে অসহ্য হয়ে সবাই মূসা ‘আলাইহিস্ সালামের কাছে পাকাপাকি ওয়াদা করল যে, তারা এ সমস্ত আযাব থেকে মুক্তি পেলে মূসা ‘আলাইহিস্ সালামের উপর ঈমান আনবে । মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম দো‘আ করলেন, ফলে তারা এ সমস্ত আযাব থেকে মুক্তি পেল । কিন্তু যে জাতির উপর আল্লাহ্‌র আযাব চেপে থাকে, তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-চেতনা কোন কাজই করে না । কাজেই এ ঘটনার পরেও আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় আঁকড়ে বসল এবং ঈমান আনতে অস্বীকার করল ।

(১) এখানে শাস্তি বলে মহামারী জাতীয় কিছু বুঝানো হয়েছে । রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘মহামারী এমন একটি শাস্তি যা আল্লাহ্ বনী ইস্‌রাঈলের উপর পাঠিয়েছিলেন । সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোথাও তা বিদ্যমান তখন তোমরা সেখানে যেও না । আর যদি মহামারী এলাকায় তোমরা থাক, তবে সেখান থেকে পালানোর জন্য বের হয়ো না । [বুখারীঃ ৬৯৭৪, মুসলিমঃ ২২১৮]

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ
كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. কাজেই আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছি। কারণ তারা আমাদের নিদর্শনকে অস্বীকার করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল গাফেল।

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۗ
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ۙ
بِمَا صَبَرُوْا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ
وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে আমরা আমাদের কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি(১); এবং বনী ইস্‌রাঈল সম্বন্ধে আপনার রবের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হল, যেহেতু তারা ধৈর্য ধরেছিল, আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি।

---

(১) বলা হয়েছেঃ "যে জাতিকে দুর্বল ও হীন বলে মনে করা হত, তাদেরকে আমি সে ভূমির উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতি বানিয়ে দিয়েছি, যাতে আমি রেখেছি বরকত বা আশীর্বাদ।" কুরআনের শব্দগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে "যে জাতিকে ফির'আউনের সম্প্রদায় দুর্বল ও হীন মনে করেছিল" বলা হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি যে, "যে জাতি দুর্বল ও হীন ছিল।" এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে জাতির সহায়তায় থাকেন প্রকৃতপক্ষে তারা কখনো দুর্বল হয় না। যদিও কোন সময় তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে অন্যান্য লোক ধোঁকায় পড়ে যায় এবং তাদেরকে দুর্বল বলে মনে করে বসে। কিন্তু শেষ পরিণতির ক্ষেত্রে সবাই দেখতে পায় যে, তারা মোটেই দুর্বল ও হীন ছিল না। কারণ, প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌রই হাতে।
আর যমীনের মালিক বানিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে وَأَوْرَثْنَا শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। مَشَارِقَ শব্দটি مَشْرِقٌ এর বহুবচন। আর مَغَارِب হচ্ছে مَغْرِبٌ এর বহুবচন। শীত ও গ্রীষ্মের বিভিন্ন ঋতুতে যেহেতু সূর্যের উদয়াস্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে, সেহেতু এখানে 'মাশারিক' বা উদয়াচলসমূহ এবং 'মাগারিব' বা অস্তাচলসমূহ বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ভূমি ও যমীন বলতে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরীনের মতে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে- যাতে আল্লাহ্ তা'আলা কওমে-ফির'আউন ও কওমে-আমালেকাকে ধ্বংস করার পর বনী-ইস্‌রাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন। [ইবন কাসীর; সা'দী]

১৩৮. আর আমরা বনী ইস্‌রাঈলকে সাগর পার করিয়ে দেই; তারপর তারা মূর্তিপূজায় রত এক জাতির কাছে উপস্থিত হয়। তারা বলল, 'হে মূসা! তাদের মা'বুদদের ন্যায় আমাদের জন্যও একজন মা'বুদ স্থির করে দাও(১)। তিনি বললেন, 'তোমরা তো এক জাহিল সম্প্রদায়।'

وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ۗ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿١٣٨﴾

১৩৯. 'এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো বিধ্বস্ত করা হবে এবং তারা যা করছে তাও অমূলক।'

اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٩﴾

১৪০. তিনি আরো বললেন, 'আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ্ খোঁজ করব অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন?'

قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٤٠﴾

১৪১. আর স্মরণ কর, যখন আমরা তোমাদেরকে ফির'আউনের

وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ

---

(১) বনী ইসরাঈলদের মত অবস্থা এ উম্মতের মধ্যে ঘটেছে এবং নিত্য ঘটছে। এ উম্মাতের মধ্যেও কিছু না বুঝে না শুনে অন্যান্য জাতির অনুকরণে শির্ক ও কুফরী করার মানসিকতা রয়ে গেছে। আবু ওয়াকিদ আল-লাইসি বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদীসে এসেছে, আবু ওয়াকিদ বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুনাইনের দিকে এক যুদ্ধে বের হলাম। আমরা একটা বরই গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহর নবী! আমাদের জন্য এ গাছটিকে লটকানোর জন্য নির্ধারিত করে দিন যেমনটি নির্ধারিত রয়েছে কাফেরদের জন্য। কারণ কাফেরদের একটি বরই গাছ ছিল যাতে তারা তাদের হাতিয়ার লটকিয়ে রাখত এবং তার চতুষ্পার্শ ঘিরে বসত। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহু আকবার! এটা তো এমন যেমন বনী ইসরাঈল মূসাকে বলেছিলঃ "তাদের যেমন অনেক উপাস্য রয়েছে আমাদের জন্যও তেমন উপাস্য নির্ধারিত করে দিন"। অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে'। [তিরমিযীঃ ২১৮০, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২১৮, ইবন হিব্বানঃ ৬৭০২]

الْعَذَابِ ۚ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ
نِسَآءَكُمْ ۗ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴿١٤١﴾

অনুসারীদের হাত থেকে উদ্ধার করেছি যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। তারা তোমাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; এতে ছিল তোমাদের রবের এক মহাপরীক্ষা(১)।

---

(১) অর্থাৎ আমরা বনী-ইস্‌রাঈলকে সাগর পার করে দিয়েছি। ফির'আউন সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় বনী-ইস্‌রাঈলের যে অলৌকিক কৃতকার্যতা ও প্রশান্তি লাভ হয়, তার সে প্রতিক্রিয়াই হয়েছে যা সাধারণতঃ প্রাচুর্য আসার পর বস্তুবাদী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ তারাও ভোগবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করল। ঘটনাটি হল এই যে, এই জাতি মূসা 'আলাইহিস্ সালামের মু'জিযা বলে সদ্য লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিল এবং গোটা ফির'আউন সম্প্রদায়ের সাগরে ডুবে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু অগ্রসর হতেই তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর বাসভূমির উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। এই দেখে বনী ইস্‌রাঈলেরও তাদের সেসব রীতি-নীতি পছন্দ হতে লাগল। তাই মূসা 'আলাইহিস্ সালামের নিকট আবেদন জানাল, এসব লোকের যেমন বহু উপাস্য রয়েছে, আপনি আমাদের জন্যও এমনি ধরণের কোন একটা উপাস্য নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা একটা দৃষ্ট বস্তুকে সামনে রেখে ইবাদাত করতে পারি, আল্লাহ্‌র সত্তা তো আর সামনে আসে না। মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বললেন, "তোমাদের মধ্যে বড়ই মূর্খতা রয়েছে"। যাদের রীতি-নীতি তোমরা পছন্দ করছ, তাদের সমস্ত আমল তো বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গেছে। এরা মিথ্যার অনুগামী। তাদের এসব ভ্রান্ত রীতি-নীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমি কি তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য বানিয়ে দেব? অথচ তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়াবাসীর উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। কারণ, তখন মূসা 'আলাইহিস্ সালামের উপর যারা ঈমান এনেছিল, তারাই ছিল অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশী মর্যাদাসম্পন্ন ও উত্তম। অতঃপর বনী-ইস্‌রাঈলকে তাদের বিগত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, ফির'আউনের কওমের হাতে তারা এমনই নির্যাতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করে নারীদেরকে অব্যাহতি দেয়া হত সেবাদাসী বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ মূসা 'আলাইহিস্ সালামের বদৌলতে এবং তার দো'আর বরকতে তাদেরকে সে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই অনুগ্রহের প্রভাব কি এই হওয়া উচিত যে, তোমরা সেই রাব্বুল 'আলামীনের সাথে দুনিয়ার নিকৃষ্টতম পাথরকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে। এযে মহা যুলুম। এই থেকে তাওবাহ্ কর।

সতেরতম রুকূ'

১৪২. আর মূসার জন্য আমরা ত্রিশ রাতের ওয়াদা করি⁽¹⁾ এবং আরো দশ দিয়ে তা পূর্ণ করি। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাতে⁽²⁾ পূর্ণ হয়। এবং মূসা তার ভাই হারূনকে বললেন, 'আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনি আমার প্রতিনিধিত্ব করবেন, সংশোধন করবেন আর বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না⁽³⁾।

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا
بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ
وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ
قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ
الْمُفْسِدِيْنَ ﴿١٤٢﴾

---

(১) وَاعَدْنَا শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল দু'পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি দান করা। এখানেও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ছিল তাওরাত দানের প্রতিশ্রুতি আর মূসা 'আলাইহিস্ সালামের পক্ষ থেকে চল্লিশ রাত এবং এ'তেকাফের প্রতিজ্ঞা। কাজেই وَعَدْنَا না বলে وَاعَدْنَا বলা হয়েছে। ওয়াদার তাৎপর্য হল, কাউকে লাভজনক কোন কিছু দেয়ার পূর্বে তা প্রকাশ করে দেয়া যে, তোমার জন্য অমুক কাজ করব। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি স্বীয় কিতাব নাযিল করার ওয়াদা করেছেন এবং সেজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালাম ত্রিশ রাত্রি তূর পর্বতে আল্লাহ্র ইবাদাতে অতিবাহিত করবেন। অতঃপর এই ত্রিশ রাত্রির উপর আরো দশ রাত্রি বাড়িয়ে চল্লিশ রাত্রি করে দিয়েছেন।

(২) এখান থেকে একটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, নবী-রাসূলগণের শরী'আতে তারিখের হিসাব ধরা হতো রাত থেকে। কারণ, এ আয়াতে ত্রিশ দিনের ক্ষেত্রে ত্রিশ রাত্রি আর চল্লিশ দিনের ক্ষেত্রে চল্লিশ রাত্রি উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ সৌর হিসাব পার্থিব লাভের জন্য, আর চান্দ্র হিসাব হলো ইবাদতের জন্য। [কুরতুবী]

(৩) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা অনুসারে তূর পর্বতে গিয়ে যখন এ'তেকাফ করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় ভাই হারূন 'আলাইহিস্ সালামকে বললেনঃ "আমার অবর্তমানে আপনি আমার সম্প্রদায়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করুন।" এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন তবে প্রয়োজনবোধে কোথাও যেতে হলে সে কাজের ব্যবস্থাপনার জন্য কোন লোক নিয়োগ করে যাওয়া উত্তম। [কুরতুবী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ রীতি এই ছিল যে, কখনো যদি তাকে মদীনার বাইরে যেতে হত, তখন তিনি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যেতেন। একবার তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে

১৪৩. আর মূসা যখন আমাদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলেন এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন⁽¹⁾, তখন তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে দর্শন দান করুন, আমি আপনাকে দেখব'। তিনি বললেন, 'আপনি আমাকে

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِى وَلَٰكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِى ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَٰنَكَ تُبْتُ

প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন এবং একবার আব্দুল্লাহ্ ইবন উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে খলীফা নিযুক্ত করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমকে মদীনায় খলীফা নিযুক্ত করে তিনি বাইরে যেতেন। [কুরতুবী]

মূসা 'আলাইহিস্ সালাম হারূন 'আলাইহিস্ সালামকে খলীফা নিযুক্ত করার সময় তাকে কয়েকটি উপদেশ দান করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে,কাজের সুবিধার জন্য প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে যেতে হয়। এই হেদায়াত বা নির্দেশাবলীর মধ্যে প্রথম নির্দেশ হল وَأَصْلِحْ এখানে أَصْلِحْ এর কোন 'কর্ম' উল্লেখ করা হয়নি যে, কার ইসলাহ্ বা সংশোধন করা হবে। এতে বুঝা যায় যে, নিজেরও ইসলাহ্ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সম্প্রদায়েরও ইসলাহ্ করবেন। অর্থাৎ তাদের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামাজনিত কোন বিষয় আঁচ করতে পারলে তাদেরকে সরল পথে আনয়নের চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয় হেদায়াত হল এই যে, ﴿وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ﴾ অর্থাৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না। বলাবাহুল্য, হারূন 'আলাইহিস্ সালাম হলেন আল্লাহ্‌র নবী, তার নিজের পক্ষে ফাসাদে পতিত হওয়ার কোন আশংকাই ছিল না। কাজেই এই হেদায়াতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোন সাহায্য-সহায়তা করবেন না। সুতরাং হারূন 'আলাইহিস্ সালাম যখন দেখলেন, তার সম্প্রদায় 'সামেরী'-এর অনুগমন করতে শুরু করে দিয়েছে, তখন তার সম্প্রদায়কে এহেন ভণ্ডামী থেকে বাধা দান করলেন এবং সামেরীকে সে জন্য শাসালেন। অতঃপর ফিরে এসে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম যখন ধারণা করলেন যে, হারূন 'আলাইহিস্ সালাম আমার অবর্তমানে কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন, তখন তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করলেন।

(১) কুরআনের প্রকৃষ্ট শব্দের দ্বারাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সাথে কথা বলেছেন। তাঁর এ কালাম দ্বারা উদ্দেশ্য প্রথমতঃ সেসব কালাম যা নবুওয়াত দানকালে হয়েছিল। আর দ্বিতীয়তঃ সেসব কালাম যা তাওরাত দানকালে হয়েছিল এবং যার আলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের কথা বলা হক ও বাস্তব। এতে বিশ্বাস করতেই হবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ 'কথা বলা' সাব্যস্ত হচ্ছে। [দেখুন, সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াসসুন্নাহ্, ২১৬-২১৯]

إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

দেখতে পাবেন না(১)। আপনি বরং পাহাড়ের দিকেই তাকিয়ে দেখুন(২), সেটা যদি নিজের জায়গায় স্থির থাকে তবে আপনি আমাকে দেখতে পাবেন।' যখন তাঁর রব পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন(৩) তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন(৪)। যখন তিনি জ্ঞান ফিরে

---

(১) দর্শন যদিও অসম্ভব নয়, কিন্তু যার প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ মূসা 'আলাইহিস্ সালাম বর্তমান অবস্থায় তা সহ্য করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে দর্শন যদি আদৌ সম্ভব না হত, তাহলে ﴿لَن تَرَىٰنِي﴾ না বলে বলা হত لَنْ أُرَى "আমার দর্শন হতে পারে না।" এতে প্রমাণিত হয় যে, যৌক্তিকতার বিচারে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ যদিও সম্ভব, কিন্তু তবুও এতে তার সংঘটনের অসম্ভবতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর এটাই হল অধিকাংশ আহ্‌লে সুন্নাহ্‌র মত যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দীদার বা দর্শন লাভ যুক্তিগতভাবে সম্ভব হলেও শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। যেমন হাদীসে রয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার রবকে দেখতে পারবে না।' [মুসলিমঃ ২৯৩১, আবু দাউদঃ ৪৩২০, ইবন মাজাহ্ঃ ৪০৭৭] এ ব্যাপারে সূরা আল-আন'আমের ১০নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বর্তমান অবস্থায় দর্শক আল্লাহ্‌র দর্শন সহ্য করতে পারবে না বলেই পাহাড়ের উপর যৎসামান্য ছটা বিকিরণ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাও আপনার পক্ষে সহ্য করা সম্ভবপর নয়; মানুষ তো একান্ত দুর্বলচিত্ত সৃষ্টি; সে তা কেমন করে সহ্য করবে?

(৩) আরবী অভিধানে تَجَلَّى অর্থ প্রকাশিত ও বিকশিত হওয়া। আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাথায় বৃদ্ধাঙ্গুলিটি রেখে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার এতটুকু অংশই শুধু প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে পাহাড় পর্যন্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল। অবশ্য এতে গোটা পাহাড়ই যে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেতে হবে তা অপরিহার্য নয়; বরং পাহাড়ের যে অংশে আল্লাহ্‌র তাজাল্লী বিচ্ছুরিত হয়েছিল, সে অংশটিই হয়ত প্রভাবিত হয়ে থাকবে। [আহমাদঃ ৩/১২৫, তিরমিযীঃ ৩০৭৪, হাকেমঃ ২/৩২০]

(৪) মূসা 'আলাইহিস্ সালাম সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলায় তার পুরস্কারস্বরূপ হাশরের মাঠে তাকে প্রথম সচেতন হিসাবে দেখা যাবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কেয়ামতের মাঠে মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে, আমিই সর্বপ্রথম সংজ্ঞা ফিরে পাব, তখন দেখতে পাব যে, মূসা আল্লাহ্‌র আরশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

পেলেন তখন বললেন, ‘মহিমাময় আপনি, আমি অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে তাওবাহ্ করছি এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম ।’

قَالَ يٰمُوسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

১৪৪. তিনি বললেন, ‘হে মূসা! আমি আপনাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দিয়ে মানুষের উপর বেছে নিয়েছি; কাজেই আমি আপনাকে যা দিলাম তা গ্রহণ করুন এবং শোকর আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হোন ।

وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ

১৪৫. আর আমরা তার জন্য ফলকসমূহে⁽¹⁾ সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে⁽²⁾ দিয়েছি; সুতরাং

আমি জানি না তিনি কি আমার আগে সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছেন, না কি তূর পাহাড়ে যে সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন, তার বিনিময়ে তিনি সচেতনই ছিলেন ।’ [বুখারীঃ ৪৬৩৮, মুসলিমঃ ২৩৭৪]

(১) এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা তাওরাতের পাতা বা তখ্‌তী মূসা ‘আলাইহিস্ সালামকে অর্পণ করা হয়েছিল । আর সে তখ্‌তীগুলোর নামই হল ‘তাওরাত’ । কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এ তখতীগুলো তাওরাতের আগে প্রদত্ত । [ইবন কাসীর]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘আদম এবং (মূসা ‘আলাইহিমাস্ সালাম) তর্ক করলেন । মূসা বললেন, আপনিই তো আমাদের পিতা, আশা-ভরসা সব শেষ করে দিয়ে আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে নিয়ে আসলেন । আদম বললেন, হে মূসা, আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য পছন্দ করেছেন, স্বহস্তে আপনার জন্য লিখে দিয়েছেন । আপনি আমাকে এমন বিষয়ে কেন তিরস্কার করছেন, যা আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আমার তাকদীরে লিখেছেন । এভাবে আদম মূসার উপর তর্কে জিতে গেলেন । তিনবার বলেছেন । [বুখারীঃ ৬৬১৪] এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা‘আলা নিজ হাতে তাওরাত লিখেছেন এবং আদম ‘আলাইহিস্ সালামের জান্নাত থেকে বের হওয়াটা যেহেতু বিপদ ছিল সেহেতু তিনি তাকদীরের দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন । মূলতঃ তাকদীরের দ্বারা দলীল গ্রহণ শুধুমাত্র বিপদের সময়ই জায়েয । গোনাহ্‌র কাজের মধ্যে জায়েয নাই । [মাজমু ফাতাওয়া ৮/১০৭; দারয়ূ তা‘আরুযুল আকলি ওয়ান নাকলি: ৪/৩০৩]

قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُورِيكُمْ دَارَ
الْفٰسِقِيْنَ ﴿١٤٥﴾

এগুলো শক্তভাবে ধরুন এবং আপনার সম্প্রদায়কে তার যা উত্তম তাই গ্রহণ করতে নির্দেশ দিন(১)। আমি শীঘ্রই(২) ফাসেকদের বাসস্থান(৩) তোমাদেরকে দেখাব।

---

(১) অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের ওয়াজিব ও মুস্তাহাবগুলো গ্রহণ কর। আর নিষেধকৃত বস্তু পরিত্যাগ কর [সা'দী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] অথবা আয়াতের অর্থ, আল্লাহ্‌র বাণীর যদি কয়েক ধরনের অর্থ হয়, তখন যেন তারা কেবল উত্তম ও আল্লাহ্‌র শানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থটিই গ্রহণ করে। [ইবন কাসীর: আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ]

(২) অর্থাৎ সামনে অগ্রসর হয়ে তোমরা এমন সব জাতির প্রাচীন ধ্বংশাবশেষ দেখবে যারা আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং ভুল পথে চলার ব্যাপারে অবিচল ছিল। সেই ধ্বংশাবশেষগুলো দেখে এ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বনের পরিণাম কি হয় তা তোমরা নিজেরাই জানতে পারবে।

(৩) আয়াতের এক অর্থ উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, "আমি শীঘ্রই ফাসেকদের বাসস্থান তোমাদের দেখাব।" এ হিসেবে এখানে ফাসেকদের বাসস্থান বলতে কি বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। একটি মিসর, অপরটি শাম বা সিরিয়া। কারণ, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের বিজয়ের পূর্বে মিসরে ফির'আউন এবং তার সম্প্রদায় ছিল শাসক ও প্রবল। এ হিসাবে মিসরকে 'দারুল ফাসেকীন' বা পাপাচারীদের আবাসস্থল বলা যায়। [ফাতহুল কাদীর] আর সিরিয়ায় যেহেতু তখন আমালেকা সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যেহেতু ওরাও ছিল ফাসেক বা পাপাচারী, সেহেতু তখন সিরিয়াও ছিল ফাসেকদেরই আবাসভূমি। [ফাতহুল কাদীর; ইবন কাসীর] এতদুভয় অর্থের কোন্‌টি যে এখানে উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর তার ভিত্তি হল এই যে, ফির'আউনের সম্প্রদায় ডুবে মরার পর বনী-ইস্‌রাঈলরা মিসরে ফিরে গিয়েছিল কি না? যদি মিসরে ফিরে গিয়ে থাকে এবং মিসর সাম্রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে; যেমন ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ﴾ আয়াতের দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়, তবে মিসরে তাদের আধিপত্য আলোচ্য তূর পর্বতে তাজাল্লী বা জ্যোতি বিকিরণের ঘটনার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে এ আয়াতে ﴿دَارَ الْفٰسِقِيْنَ﴾ অর্থ শাম দেশ বা সিরিয়াই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তখন তারা মিসরে ফিরে না গিয়ে থাকে, তাহলে উভয় দেশই উদ্দেশ্য হতে পারে। আয়াতের অপর অর্থ হচ্ছে, 'শীঘ্রই আমি যারা ফাসেক তাদেরকে তাদের কর্মকাণ্ডের পরিণাম ফল কি হবে তা দেখাব।' এ হিসেবে পরিণাম ফল হিসেবে তীহ মাঠে তাদের যে কি মারাত্মক অবস্থা হয়েছে সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। [ইবন কাসীর]

১৪৬. যমীনে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমার নিদর্শনসমূহ থেকে আমি তাদের অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব। আর তারা প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সৎপথ দেখলেও সেটাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভুল পথ দেখলে সেটাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এটা এ জন্য যে, তারা আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিল গাফেল।

سَاَصۡرِفُ عَنۡ اٰيٰتِیَ الَّذِيۡنَ يَتَكَبَّرُوۡنَ فِی
الۡاَرۡضِ بِغَيۡرِ الۡحَقِّ ؕ وَاِنۡ يَّرَوۡا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا
يُؤۡمِنُوۡا بِهَا ۚ وَاِنۡ يَّرَوۡا سَبِيۡلَ الرُّشۡدِ لَا يَتَّخِذُوۡهُ
سَبِيۡلًا ۚ وَاِنۡ يَّرَوۡا سَبِيۡلَ الۡغَیِّ يَتَّخِذُوۡهُ
سَبِيۡلًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوۡا
عَنۡهَا غٰفِلِيۡنَ ﴿۱۴۶﴾

১৪৭. আর যারা আমাদের নিদর্শন ও আখেরাতের সাক্ষাতে মিথ্যারোপ করেছে তাদের কাজকর্ম বিফল হয়ে গেছে। তারা যা করে সে অনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।

وَالَّذِيۡنَ كَذَّبُوۡا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الۡاٰخِرَةِ
حَبِطَتۡ اَعۡمَالُهُمۡ ؕ هَلۡ يُجۡزَوۡنَ اِلَّا مَا كَانُوۡا
يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۱۴۷﴾ ع

আঠারতম রুকূ'

১৪৮. আর মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুর তৈরী করল, একটা দেহ, যা 'হাম্বা' শব্দ করত। তারা কি দেখল না যে, এটা তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা এটাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল যালেম(১)।

وَاتَّخَذَ قَوۡمُ مُوۡسٰی مِنۡۢ بَعۡدِهٖ مِنۡ حُلِيِّهِمۡ
عِجۡلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ ؕ اَلَمۡ يَرَوۡا اَنَّهٗ لَا
يُكَلِّمُهُمۡ وَلَا يَهۡدِيۡهِمۡ سَبِيۡلًا ۘ اِتَّخَذُوۡهُ
وَكَانُوۡا ظٰلِمِيۡنَ ﴿۱۴۸﴾

---

(১) এ থেকে বুঝা গেল যে, যারা গো বাচ্চার পূজা করেছিল তাদের বিবেক সঠিকভাবে কাজ করেনি। তারা দেখতেই পাচ্ছিল যে, শুধু হাম্বা রব ছাড়া আর কোন কথাই তার মুখ থেকে বের হচ্ছে না। তার কাছ থেকে কোন হিদায়াতের কথা আসছে না, তারপরও সে কিভাবে ইলাহ হতে পারে? অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আরও

১৪৯. আর তারা যখন অনুতপ্ত হল এবং দেখল যে, তারা বিপথগামী হয়ে গেছে, তখন তারা বলল, ‘আমাদের রব যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবই(১) ।’

وَلَمَّا سُقِطَ فِيٓ أَيۡدِيهِمۡ وَرَأَوۡاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمۡ يَرۡحَمۡنَا رَبُّنَا وَيَغۡفِرۡ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ١٤٩

স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, “তবে কি তারা ভেবে দেখে না যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না” [সূরা ত্বা-হা:৮৯]

(১) মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম যখন তাওরাত গ্রহণ করার জন্য তূর পাহাড়ে ইবাদাত করতে গেলেন এবং ইতোপূর্বে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত ইবাদাতের যে নির্দেশ হয়েছিল; সে মতে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, ত্রিশ দিন পরে আমি ফিরে আসব, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা‘আলা যখন আরো দশ দিন মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন, তখন ইস্‌রাঈলী সম্প্রদায় তাদের চিরাচরিত তাড়াহুড়া ও ভ্রষ্টতার দরুন নানা রকম মন্তব্য করতে আরম্ভ করল । তার সম্প্রদায়ে ‘সামেরী’ নামে একটি লোক ছিল । সে ছিল একান্তই দুর্বল বিশ্বাসের লোক । কাজেই সে সুযোগ বুঝে বনী-ইস্‌রাঈলের লোকদের বললঃ তোমাদের কাছে ফির‘আউন সম্প্রদায়ের যেসব অলংকারপত্র রয়েছে, সেগুলো তো তোমরা কিবতীদের কাছ থেকে ধার করে এনেছিলে, এখন তারা সবাই ডুবে মরেছে, আর অলংকারগুলো তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে, কাজেই এগুলো আমাকে দাও । বনী-ইস্‌রাঈলরা তার কথামত সমস্ত অলংকারাদি তার (সামেরীর) কাছে এনে জমা দিল । সে এই সোনা-রুপা দিয়ে একটি বাছুরের প্রতিমূর্তি তৈরী করল এবং জিব্‌রীল ‘আলাইহিস্ সালাম-এর ঘোড়ার খুরের তলার মাটি যা পূর্ব থেকেই তার কাছে রাখা ছিল, সোনা-রুপাগুলো আগুনে গলাবার সময় সে তাতে ঐ মাটি মিশিয়ে দিল । ফলে বাছুরের প্রতিমূর্তিটিতে জীবনী শক্তির নিদর্শন সৃষ্টি হল এবং তার ভিতর থেকে গাভীর মত হাম্বা রব বেরুতে লাগল । এ ক্ষেত্রে ﴿عِجۡلًا﴾ শব্দের ব্যাখ্যায় ﴿جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ﴾ বলে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে । [ইবন কাসীর]

সামেরীর এ আবিস্কার যখন সামনে উপস্থিত হল, তখন সে বনী-ইস্‌রাঈলদেরকে কুফরীর প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, “এটাই হল ইলাহ্ । মূসা ‘আলাইহিস্ সালাম তো আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলার জন্য গেছেন তূর পাহাড়ে । মূসা ‘আলাইহিস্ সালামের সত্যিই ভুলই হয়ে গেল ।” বনী-ইস্‌রাঈলদের সবাই পূর্ব থেকেই সামেরীর কথা শুনত । আর এখন তার এই অদ্ভুত ম্যাজিক দেখার পর তো আর কথাই নেই; সবাই একেবারে তার ভক্তে পরিণত হয়ে গেল এবং সে বাছুরকে ইলাহ্ মনে করে তারই ইবাদাতে প্রবৃত্ত হল ।

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا ۙ
قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِى مِنۢ بَعْدِىٓ ۖ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ
رَبِّكُمْ ۖ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥٓ
إِلَيْهِ ۚ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِى
وَكَادُوا۟ يَقْتُلُونَنِى فَلَا تُشْمِتْ بِىَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا
تَجْعَلْنِى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. আর মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুদ্ধ হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসলেন তখন বললেন, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ! তোমাদের রবের আদেশের আগেই তোমরা তাড়াহুড়ো করলে?' এবং তিনি ফলকগুলো ফেলে দিলেন⁽¹⁾ আর তার ভাইকে চুলে ধরে নিজের দিকে টেনে আনতে লাগলেন। হারূন বললেন, 'হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। সুতরাং তুমি আমার সাথে এমন করবে না যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে না।'

قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِى رَحْمَتِكَ ۖ
وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٥١﴾

১৫১. মূসা বললেন, 'হে আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আপনার রহমতের মধ্যে প্রবিষ্ট করুন। আর আপনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

উনিশতম রুকূ'

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن
رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى

১৫২. নিশ্চয় যারা গো-বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, দুনিয়ার জীবনে তাদের উপর তাদের রবের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'কানে শুনা খবর কখনো চাক্ষুষ দেখার মত হয় না। মহান আল্লাহ্ মূসাকে বাছুর নিয়ে কি করেছে তা জানানোর পরে তিনি তখতিগুলোকে ফেলে দেন নি, তারপর যখন তাদের কর্মকাণ্ড স্বচক্ষে দেখলেন তখন তখ্‌তীগুলোকে ফেলে দিলেন। ফলে সেগুলো ভেঙ্গে যায়।' [মুসনাদে আহমাদঃ ১/২৭১]

الْمُفْتَرِيْنَ ﴿١٥٢﴾

আপতিত হবেই⁽¹⁾। আর এভাবেই আমরা মিথ্যা রটনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি⁽²⁾।

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْۤا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥٣﴾

১৫৩. আর যারা অসৎকাজ করে, তারা পরে তওবা করলে ও ঈমান আনলে আপনার রব তো এরপরও পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু⁽³⁾।

---

(১) আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, কোন কোন পাপের শাস্তি পার্থিব জীবনেই পাওয়া যায়, যেমনটি হয়েছিল সামেরী ও তার সঙ্গীদের বেলায়, কারণ গোবৎস উপাসনা থেকে যখন তারা যথার্থভাবে তাওবাহ্ করল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সামেরীকে এ পৃথিবীতে অপমান-অপদস্থ করে ছেড়েছেন। তাকে মূসা 'আলাইহিস্ সালাম নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সে যেন সকলের কাছ থেকে পৃথক থাকে; সেও যাতে কাউকে না ছোঁয় এবং তাকেও যেন কেউ না ছোঁয়। সুতরাং সারাজীবন এমনিভাবে জীবজন্তুর সাথে বসবাস করতে থাকে; কোন মানুষ তার সংস্পর্শে আসত না। কাতাদাহ্ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর এমন আযাব চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখনই সে কাউকে স্পর্শ করত কিংবা তাকে কেউ স্পর্শ করত, তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই গায়ে জ্বর এসে যেত। [কুরতুবী]

(২) অর্থাৎ "যারা আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তাদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি।" সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ্ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ 'যারা দ্বীনী ব্যাপারে বিদ'আত অবলম্বন করে (অর্থাৎ দ্বীনে কোন প্রকার কুসংস্কার সৃষ্টি অথবা গ্রহণ করে,) তারাও আল্লাহ্র প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে অপরাধী হয়ে সে শাস্তিরই যোগ্য হয়ে পড়ে। ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, দ্বীনী ব্যাপারে যারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন বিদ'আত বা কুসংস্কার আবিস্কার করে তাদের শাস্তি এই যে, তারা আখেরাতে আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হবে এবং পার্থিব জীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে। [ইবন কাসীর;কুরতুবী]

(৩) এ আয়াতে সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সতর্কীকরণের পর নিজেদের এই অপরাধের জন্য তাওবাহ্ করে নিয়েছে এবং তাওবাহ্র জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে কঠোরতর শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, তাদেরই একজন অপরজনকে হত্যা করতে থাকলেই তাওবাহ্ কবূল হবে- তারা সে শর্তও পালন করল, তখন মূসা 'আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশক্রমে তাদেরকে বললেনঃ তোমাদের সবার তাওবাহ্ই কবুল হয়েছে। এই হত্যাযজ্ঞে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, তারা শহীদ হয়েছে আর যারা বেঁচে রয়েছে, তারা এখন ক্ষমাপ্রাপ্ত। [তাবারী] এ আয়াতে বলা হয়েছে, যেসব লোক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা সে কাজ যত বড় পাপই হোক, কুফরীও যদি হয়, তবুও পরবর্তীতে তাওবাহ্ করে নিলে

১৫৪. আর মূসার রাগ যখন প্রশমিত হল, তখন তিনি ফলকগুলো তুলে নিলেন। যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য সে কপিগুলোতে(১) যা লিখিত ছিল তাতে ছিল হিদায়াত ও রহমত।

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ ۖ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫. আর মূসা তার সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোককে আমাদের নির্ধারিত স্থানে একত্র হওয়ার জন্য মনোনীত করলেন। অত:পর তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, তখন মূসা বললেন, 'হে আমার রব! আপনি ইচ্ছে করলে আগেই তো এদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতেন! আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা যা করেছে সে জন্য কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? এটা তো শুধু আপনার পরীক্ষা, যা দ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছে বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছে সৎপথে পরিচালিত করেন। আপনিই তো আমাদের অভিভাবক; কাজেই আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং

وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

এবং ঈমান ঠিক করে ঈমানের দাবী অনুযায়ী নিজের আমল বা কর্ম সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ্ তাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই কারো দ্বারা কোন পাপ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে তাওবাহ্ করে নেয়া একান্ত কর্তব্য।

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মূসা 'আলাইহিস্ সালামের রাগ যখন প্রশমিত হয়,তখন তাড়াতাড়ি ফেলে রাখা তাওরাতের তখতিগুলি আবার তুলে নিলেন। نسخة বা সংকলন বলা হয় সে লেখাকে যা কোন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, মূসা আলাইহিস সালাম ক্রোধবশত যখন তাওরাতের তখতিগুলি মাথা থেকে তাড়াহুড়া করে নামিয়ে রাখেন, তখন সেগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা পরে অন্য কোন কিছুতে লিখে তাওরাত দিয়েছিলেন, একেই নোসখা বলা হয়। [কুরতুবী]

আমাদের প্রতি দয়া করুন। আর ক্ষমাশীলদের মধ্যে আপনিই তো শ্রেষ্ঠ।’

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي
الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاۤ اِلَيْكَ ؕ قَالَ عَذَابِيْۤ اُصِيْبُ
بِهٖ مَنْ اَشَآءُ ۚ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ؕ
فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ
وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٦﴾

১৫৬. ‘আর আপনি আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে কল্যাণ লিখে দিন এবং আখেরাতেও। নিশ্চয় আমরা আপনার কাছে ফিরে এসেছি(১)।’ আল্লাহ্ বললেন, ‘আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছে দিয়ে থাকি আর আমার দয়া- তা তো প্রত্যেক বস্তুকে ঘিরে রয়েছে(২)।

---

(১) কুরআনের শব্দ هُدْنَا অর্থ আমরা ফিরে এসেছি অথবা তাওবাহ্ করেছি। কোন কোন মুফাস্সির বলেন, এই শব্দ থেকে তাদের নামকরণ করা হয়েছে ‘ইয়াহূদ’। [ইবন কাসীর]

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়েই অহংকার করল। জাহান্নাম বলল, হে রব! আমার কাছে প্রবেশ করে প্রতাপান্বিত-অত্যাচারী, অহংকারী, রাজা-বাদশা ও নেতাগোছের লোকেরা। আর জান্নাত বলল, হে রব! আমার কাছে প্রবেশ করে দূর্বল, ফকীর, মিসকীনরা। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা জাহান্নামকে বললেন, তুমি আমার শাস্তি। তোমার দ্বারা যাকে ইচ্ছা আমি তাকে তা পৌঁছাই। আর জান্নাতকে বললনে, তুমি আমার রহমত, যা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর তোমাদের প্রত্যেককেই পূর্ণ করা আমার দায়িত্ব। তখন জাহান্নামে তার বাসিন্দাদের নিক্ষেপ করা হবে......।” [মুসনাদে আহমাদ ৩/১৩; ৭৮] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ্ তা‘আলা একশত রহমত সৃষ্টি করেছেন। তা থেকে মাত্র একটি রহমত তিনি সৃষ্টিকুলকে দিয়েছেন। প্রতিটি রহমত আসমান ও যমীনের চেয়েও প্রকাণ্ড। এর কারণেই মা তার সন্তানকে দয়া করে, এর কারণেই পাখি ও জীব-জন্তু পানি পান করে। অতঃপর যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তখন তিনি সমস্ত সৃষ্টিকুল থেকে এ রহমতটি নিয়ে নিবেন এবং এটি ও বাকী ৯৯টির সবগুলিই তিনি মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট করবেন। আর এটাই হচ্ছে আল্লাহ্র এ আয়াত, “কাজেই আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে”এর মর্ম। [মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাহ: ১৩/১৮২] কাতাদা ও হাসান বলেন, দুনিয়াতে তিনি নেককার ও বদকার সবার জন্যই রহমত লিখেছেন তবে আখেরাতে তা শুধু মুত্তাকীদের জন্য। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস বলেন, এখানে তাকওয়া অর্থ শির্ক থেকে বেঁচে থাকা। [তাবারী] কাতাদা বলেন, যাবতীয় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা। [তাবারী]

কাজেই আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমাদের আয়াতসমূহে ঈমান আনে ।

১৫৭. 'যারা অনুসরণ করে রাসূলের, উম্মী(১) নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ পায়(২),

اَلَّذِيۡنَ يَتَّبِعُوۡنَ الرَّسُوۡلَ النَّبِىَّ الۡاُمِّىَّ الَّذِىۡ يَجِدُوۡنَهٗ مَكۡتُوۡبًا عِنۡدَهُمۡ فِى التَّوۡرٰىةِ

---

(১) আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি পদবী 'রাসূল' ও 'নবী' এবং এর সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য 'উম্মী'-এরও উল্লেখ করা হয়েছে । ইবন আব্বাস বলেন, أُمِّي 'উম্মী' শব্দের অর্থ হল নিরক্ষর । যে লেখা-পড়া কোনটাই জানে না । [বাগভী] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেছেন, "আমরা নিরক্ষর জাতি । লিখা জানি না, হিসাব জানি না" । [বুখারী: ১০৮০] সাধারণ আরবদেরকে এ কারণেই কুরআন أُمِّيِّيْنَ বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করেছে যে, তাদের মধ্যে লেখা-পড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল । কারও কারও মতে উম্মী শব্দটি 'উম্ম' শব্দের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বলা হয়েছে । আর উম্ম অর্থ, মা । অর্থাৎ সে তার মা তাকে যেভাবে প্রসব করেছে সেভাবে রয়ে গেছে । কারও কারও মতে শব্দটি 'উম্মত' শব্দের দিকে সম্পর্কযুক্ত করে বলা হয়েছে । পরে সম্পর্ক করার নিয়মানুসারে 'তা' বর্ণটি পড়ে গেছে । তখন অর্থ হবে, উম্মতওয়ালা নবী । কারও কারও মতে, শব্দটি 'উম্মুল কুরা' যা মক্কার এক নাম, সেদিকে সম্বন্ধযুক্ত করে বলা হয়েছে । অর্থাৎ মক্কাবাসী । [বাগভী]

তবে বিখ্যাত মত হচ্ছে যে, উম্মী অর্থ নিরক্ষর । যদিও নিরক্ষর হওয়াটা কোন মানুষের জন্য প্রশংসনীয় গুণ নয়; বরং ত্রুটি হিসাবেই গণ্য । কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান-গরিমা, তত্ত্ব ও তথ্য অবগতি এবং অন্যান্য গুণবৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও উম্মী হওয়া তার পক্ষে বিরাট গুণ ও পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে । কারণ, শিক্ষাগত, কার্যগত ও নৈতিক পরাকাষ্ঠা যদি কোন লেখাপড়া জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহলে তা হয়ে থাকে তার সে লেখাপড়ারই ফলশ্রুতি, কিন্তু কোন একান্ত নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব ও অনন্য তত্ত্ব-তথ্য ও সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ পেলে, তা তার প্রকৃষ্ট মু'জিযা ছাড়া আর কি হতে পারে?

(২) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব গুণবৈশিষ্ট্য তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলোর কিছু আলোচনা তাওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে কুরআনুল কারীমেও করা হয়েছে । আর কিছু সে সমস্ত মনীষীবৃন্দের উদ্ধৃতিতে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের আসল সংকলন স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা নিজে পড়েই

মুসলিম হয়েছেন। যেমন, কোন এক ইয়াহূদী বালক নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করত। হঠাৎ সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অবস্থা জানার জন্য সেখানে গেলেন। তিনি দেখলেন, তার পিতা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তাওরাত তিলাওয়াত করছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'হে ইয়াহূদী, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি সে মহান সত্তার যিনি মূসা 'আলাইহিস্ সালামের প্রতি তাওরাত নাযিল করেছেন, তুমি কি তাওরাতে আমার অবস্থা ও গুণবৈশিষ্ট্য এবং আবির্ভাব সম্পর্কে কোন বর্ণনা পেয়েছ? সে অস্বীকার করল। তখন তার ছেলে বললঃ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি (অর্থাৎ এই ছেলের পিতা) ভুল বলছেন। তাওরাতে আমরা আপনার আলোচনা এবং আপনার গুণবৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন হক মা'বূদ নাই এবং আপনি তাঁর প্রেরিত রাসূল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন যে, এখন এ বালক মুসলিম। তার মৃত্যুর পর তার কাফন-দাফন মুসলিমরা করবে। তার পিতার হাতে দেয়া হবে না। [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এক ইয়াহূদী ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে সবগুণ বর্ণনা করেছে যা সে তাওরাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে দেখেছে। তিনি বলেন, আমি আপনার সম্পর্কে তাওরাতে এ কথাগুলো পড়েছি- "মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ্, তার জন্ম হবে মক্কায়, তিনি হিজরত করবেন 'তাইবা'র দিকে; আর তার দেশ হবে সিরিয়া। তিনি কঠোর মেজাজের হবেন না, কঠোর ভাষায় তিনি কথাও বলবেন না, হাটে-বাজারে তিনি হট্টগোলও করবেন না। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তিনি দূরে থাকবেন।" [মুস্তাদরাকঃ ২/৬৭৮ হাদীসঃ ৪২৪২]

কা'আবে আহবার বলেছেনঃ তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে লেখা রয়েছেঃ "মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল ও নির্বাচিত বান্দা। তিনি না কঠোর মেজাজের লোক, না বাজে বক্তা। না-ইবা তিনি হাটে-বাজারে হট্টগোল করার লোক। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন এবং ছেড়ে দেন। তার জন্ম হবে মক্কায়, আর হিজরত হবে তাইবায়। তার দেশ হবে শাম (সিরিয়া)। আর তার উম্মাত হবে 'হাম্মাদীন'। অর্থাৎ আনন্দ-বেদনা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তারা যে কোন উর্ধ্বারোহণকালে তাকবীর বলবে। তারা সূর্যের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যাতে সময় নির্ণয় করে যথাসময়ে সালাত আদায় করতে পারে। তিনি তার শরীরের নিম্নাংশে লুঙ্গি পরবেন এবং হস্ত-পদাদি ওযুর মাধ্যমে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। তাদের আযানদাতা আকাশে সুউচ্চ স্বরে আহ্বান করবেন। জিহাদের ময়দানে তাদের সারিগুলো এমন হবে যেমন সালাতে হয়ে থাকে। রাতের বেলায় তাদের তিলাওয়াত ও যিক্‌রের শব্দ এমনভাবে উঠতে থাকবে, যেন মধুমক্ষিকার

وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ | যিনি তাদেরকে সৎকাজের আদেশ

শব্দ। [সুনান দারামীঃ ৫, ৮, ৯]

ইবন সা'আদ রাহিমাহুল্লাহ্ সাহাল মওলা খাইসামা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে সনদ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাল বলেনঃ আমি নিজে ইঞ্জীলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ পড়েছি যে- 'তিনি খুব বেঁটেও হবেন না আবার খুব লম্বাও হবেন না। উজ্জ্বল বর্ণ ও দু'টি কেশ-গুচ্ছধারী হবেন। তার দু'কাঁধের মধ্যস্থলে নবুওয়াতের মোহর থাকবে। তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। গাধা ও উটের উপর সওয়ারী করবেন। ছাগলের দুধ নিজে দুইয়ে নেবেন। তিনি ইসমাঈল 'আলাইহিস্ সালামের বংশধর হবেন। তার নাম হবে আহ্মাদ।' [তাবাকাত ইবন সা'আদঃ১/৩৬৩]

'আতা ইবন ইয়াসার বলেনঃ আমি আব্দুল্লাহ্ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা কে বললাম, আমাকে তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাগুণ কেমন এসেছে তা বর্ণনা করুন, তিনি বললেনঃ 'তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছেঃ 'হে নবী, আমি আপনাকে সমস্ত উম্মতের জন্য সাক্ষী, সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদদাতা, অসৎকর্মীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মিয়ীন অর্থাৎ আরবদের জন্য রক্ষণা-বেক্ষণকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নাম 'মুতাওয়াক্কিল' রেখেছি। আপনি কঠোর মেজাজও নন, দাঙ্গাবাজও নন। হাটে-বাজারে হট্টগোলকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মৃত্যু দেবেন না; যতক্ষণ না তার মাধ্যমে বাঁকা জাতিকে সোজা করে নেবেন। এমনকি যতক্ষণ না তারা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ 'আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই' -এ কালেমার স্বীকৃতিদানকারী হয়ে যাবে, যতক্ষণ না অন্ধ চোখ খুলে দেবেন, বধির কান যতক্ষণ না শোনার যোগ্য বানাবেন এবং বদ্ধ হৃদয় যতক্ষণ না খুলে দেবেন।' [বুখারী : ২১২৫; ৪৮৩৮] তাওরাত ও ইঞ্জীল বর্ণিত শেষনবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার উম্মাতের গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শনসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বহু স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। রহমতুল্লাহ্ কীরানভী মুহাজেরে মক্কী রাহিমাহুল্লাহ্ তার গ্রন্থ 'ইয্হারুল-হক'-এ বিষয়টিকে অত্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও গবেষণাসহ লিখেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান যুগের তাওরাত ও ইঞ্জীল- যাতে সীমাহীন বিকৃতি সাধিত হয়েছে-তাতেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাওরাত ও ইনজীলের নিম্নোক্ত স্থানগুলো দেখুন- এসব স্থানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, দ্বিতীয় বিবরণ-১৮ঃ ১৫-১৯, মথি-২১ঃ ৩৩-৪৬, যোহন-১ঃ ১৯-২১, ১৪ঃ ১৫-১৭, ২৫-৩০, ১৫ঃ ২৫-২৬, ১৬ঃ ৭-১৫।

الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلٰلَ
الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ
وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ
أُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٥٧﴾

দেন, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করেন, তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন(১)। আর তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃংখল হতে মুক্ত করেন যা তাদের উপর ছিল(২)। কাজেই যারা তার

---

(১) দ্বিতীয় গুণটি এই বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবজাতির জন্য পবিত্র ও পছন্দনীয় বস্তু-সামগ্রী হালাল করবেন; আর পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করবেন। অর্থাৎ অনেক সাধারণ পছন্দনীয় বস্তুসামগ্রী যা শাস্তি স্বরূপ বনী-ইস্রাঈলের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোর উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নেবেন। উদাহরণতঃ পশুর চর্বি বা মেদ প্রভৃতি যা বনী-ইস্রাঈলের অসদাচরণের শাস্তি হিসাবে হারাম করে দেয়া হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোকে হালাল সাব্যস্ত করেছেন। আর নোংরা ও পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রীর মধ্যে শুকরের মাংস, সুদ এবং যে সমস্ত খাবার আল্লাহ্ হারাম করেছেন অথচ তারা সেগুলোকে হালাল বলে চালিয়েছিল। [তাবারী] অনুরূপভাবে, রক্ত, মৃত পশু, মদ ও অন্যান্য হারাম জন্তু এর অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্ হারাম উপায়ে আয় যথা- সুদ, ঘুষ, জুয়া প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত।

(২) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের উপর চেপে থাকা বোঝা ও প্রতিবন্ধকতাও সরিয়ে দেবেন। إصر 'ইসর' শব্দের অর্থ এমন ভারী বোঝা যা নিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে অক্ষম। আর أغلال 'আগলাল' غل এর বহুবচন। 'গাল্লুন' সে হাতকড়াকে বলা হয় যা দ্বারা অপরাধীর হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয় এবং সে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে। إصر 'ইসর' ও أغلال 'আগলাল' অর্থাৎ অসহনীয় চাপ ও আবদ্ধতা বলতে এ আয়াতে সে সমস্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত কর্তব্যের বিধি-বিধানকে বুঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়ের উপর একান্ত শাস্তি হিসাবে আরোপ করা হয়েছিল। যেমন, বিধর্মী কাফেরদের সাথে জিহাদ করে গনীমতের যে মাল পাওয়া যেত, তা বনী-ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল না; বরং আকাশ থেকে একটি আগুন নেমে এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিত। শনিবার দিন শিকার করাও তাদের জন্য বৈধ ছিল না। এ সমস্ত কঠিন ও জটিল বিধানসমূহ যা বনী-ইসরাঈলদের উপর আরোপিত ছিল, কুরআনে সেগুলোকে 'ইসর' ও 'আগলাল' বলা হয়েছে এবং সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব কঠিন বিধি-বিধানের পরিবর্তন অর্থাৎ এগুলোকে রহিত করে তদস্থলে সহজ বিধি-বিধান প্রবর্তন করবেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'দ্বীন সহজ।' [বুখারীঃ ৩৯]

প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে নাযিল হয়েছে সেটার অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম(১) ।

কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছেঃ ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ "আল্লাহ্ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি ।" [সূরা আল-হাজ্জঃ ৭৮]

(১) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ ও পরিপূর্ণ গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনার পর বলা হয়েছেঃ তাওরাত ও ইঞ্জীলে আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বাতলে দেয়ার পরিণতি এই যে, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার সহায়তা করবে আর সেই নূরের অনুসরণ করবে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে -অর্থাৎ যারা কুরআনের অনুসরণ করবে, তারাই হল কল্যাণপ্রাপ্ত । এখানে কল্যাণ লাভের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে । প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা, দ্বিতীয়তঃ তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তৃতীয়তঃ তার সাহায্য ও সহায়তা করা এবং চতুর্থতঃ কুরআন অনুযায়ী চলা । শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বুঝাবার জন্য ﴿وَعَزَّرُوهُ﴾ 'আয্যারূহু' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা تعزير থেকে উদ্ভুত । 'তা'যীর' অর্থ সস্নেহে বারণ করা ও রক্ষা করা । আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ﴿وَعَزَّرُوهُ﴾ 'আয্যারূহু' -এর অর্থ করেছেন শ্রদ্ধা ও সম্মান করা । অর্থাৎ রাসূল হিসাবে তার প্রতি ঈমান আনতে হবে, নির্দেশদাতা হিসাবে তার প্রতিটি নির্দেশের অনুসরণ করতে হবে, প্রিয়জন হিসাবে তার সাথে গভীরতম ভালবাসা রাখতে হবে এবং নবুওয়তের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ, তাই তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে । অপর এক আয়াতেও বলা হয়েছে ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ অর্থাৎ "তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান কর" । [সূরা আল-ফাতহঃ ৯] এছাড়া আরো কয়েকটি আয়াতে এই হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্র উপস্থিতিতে এত উচ্চস্বরে কথা বলো না, যা তার স্বর থেকে বেড়ে যেতে পারে । [দেখুন, সূরা হুজুরাতঃ ২] অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ অর্থাৎ "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল থেকে এগিয়ে যেয়ো না" । অর্থাৎ যদি মজলিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত থাকেন এবং তাতে কোন বিষয় উপস্থাপিত হয়, তাহলে তোমরা তার আগে কোন কথা বলো না । এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে কোন কোন সাহাবী বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে কেউ কথা বলবে না এবং তিনি যখন কোন কথা বলেন, তখন সবাই তা নিশ্চুপ বসে শুনবে । অনুরূপভাবে কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকার সময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এমনভাবে ডাকবে

বিশতম রুকূ'

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

১৫৮. বলুন, 'হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল(১), যিনি আসমানসমূহ ও

না; নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যেভাবে ডেকে থাক। [দেখুন, সূরা হুজুরাতঃ ২] এ আয়াতে শেষে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এ নির্দেশের খেলাফ কোন অসম্মানজনক কাজ করা হলে সমস্ত সৎকর্ম ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম যদিও সর্বক্ষণ-সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মসঙ্গী ছিলেন এবং এমতাবস্থায় সম্মান ও আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা বড়ই কঠিন হয়ে থাকে; তবুও তাদের অবস্থা এই ছিল যে, এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, যিনি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে এমনভাবে কথা বলব যেন কোন ভাইয়ের কাছে কেউ গোপন বিষয়ে বলে। [মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৪৬২] এমনি অবস্থা ছিল উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুরও। [দেখুন- বুখারীঃ ৪৮৪৫] আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা আমার কোন প্রিয় ব্যক্তি সারা বিশ্বে ছিল না। আর আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি তার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেও পারতাম না। আমার কাছে যদি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকার-অবয়ব সম্পর্কে কেউ জানতে চায়, তাহলে তা বলতে আমি এজন্য অপারগ যে, আমি কখনো তার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েও দেখিনি। [মুসলিমঃ ১২১] উরওয়া ইবন মাসউদকে মক্কাবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে মুসলিমদের অবস্থা জানার জন্য মদীনায় পাঠাল। সে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন নিবেদিত প্রাণ দেখতে পেল যে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিল যে, আমি কিস্‌রা ও কায়সারের দরবারও দেখেছি এবং সম্রাট নাজ্জাশীর সাথেও সাক্ষাত করেছি, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমার ধারণা, তোমরা কস্মিনকালেও তাদের মোকাবেলায় জয়ী হতে পারবে না। [সহীহ্ ইবনে হিব্বানঃ ১১/২১৬]

(১) এ আয়াতে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে রিসালাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জিন ও মানবজাতি তথা কেয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের বংশধরদের জন্য ব্যাপক। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি মানুষকে বলে দিনঃ "আমি তোমাদের সবার প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি"। আমার নবুওয়ত লাভ ও রিসালাতপ্রাপ্তি বিগত নবীগণের মত কোন বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ ভূখণ্ড

অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্য, বিশ্বের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য কেয়ামতকাল পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত। অন্য আয়াতেও এসেছে, “আর আমরা তো আপনাকে কেবল সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি” [সূরা সাবা: ২৮] অনুরূপভাবে সূরা আলে ইমরান: ২০; সূরা আল-আন'আম: ৯০; সূরা হূদ: ১৭; সূরা ইউসুফ: ১০৪; সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭; সূরা আল-ফুরকান: ১; সূরা ছোয়াদ: ৮৭; সূরা আল-কালাম: ৫২; সূরা আত-তাকওয়ীর: ২৭।

হাফেজ ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ্ বলেছেন যে, এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতামুন্নাবিয়্যীন বা শেষ নবী হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব ও রিসালাত যখন কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত বংশধরদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোন নতুন রাসূলের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেই না। [ইবন কাসীর]

হাদীসে এসেছে, আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমার মধ্যে কোন এক বিষয়ে মতবিরোধ হয়। তাতে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নারায হয়ে চলে যান। তা দেখে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুও তাকে মানাবার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কিছুতেই রাযী হলেন না। এমনকি নিজের ঘরে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে হাযির হন। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নিজের এহেন আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজের ঘটনা বিবৃত করেন। আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেনঃ এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন লক্ষ্য করলেন যে, উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর প্রতি ভর্ৎসনা করা হচ্ছে, তখন নিবেদন করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, দোষ আমারই বেশী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমার একজন সহচরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকাটাও কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে আমি যখন বললামঃ ‘হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সমস্ত লোকের জন্য আল্লাহ্ রাসূল। তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। শুধু এই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুই ছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।’ [বুখারীঃ ৪৬৪০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাবূক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভয় হচ্ছিল যে, শক্ররা না এ অবস্থায় আক্রমণ করে বসে। তাই তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। রাসূল সালাত শেষ

করে বললেনঃ আজকের রাতে আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোন নবী-রাসূলকে দেয়া হয়নি। তার একটি হল এই যে, আমার রিসালাত ও নবুওয়াতকে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের জন্য ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার পূর্বে যত নবী-রাসূলই এসেছেন, তাদের দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমাকে আমার শত্রুর মোকাবেলায় এমন প্রভাব দান করা হয়েছে যাতে তারা যদি আমার কাছ থেকে এক মাসের দূরত্বেও থাকে, তবুও তাদের উপর আমার প্রভাব ছেয়ে যাবে। তৃতীয়তঃ কাফেরদের সাথে যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে-গনীমত আমার জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। অথচ পূর্ববতী উম্মতদের জন্য তা হালাল ছিল না। বরং এসব মালের ব্যবহার মহাপাপ বলে মনে করা হত। তাদের গনীমতের মাল ব্যয়ের একমাত্র স্থান ছিল এই যে, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সে সমস্তকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে দিয়ে যাবে। চতুর্থতঃ আমার জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ করে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করার উপকরণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে আমাদের সালাত যমীনের যে কোন অংশে, যে কোন জায়গায় শুদ্ধ হয়, কোন বিশেষ মসজিদে সীমাবদ্ধ না হয়। পক্ষান্তরে পূর্ববতী উম্মতদের ইবাদাত শুধু তাদের উপাসনালয়েই হত, অন্য কোথাও নয়। নিজেদের ঘরে কিংবা মাঠে-ময়দানে তাদের সালাত বা ইবাদাত হত না। তাছাড়া পানি ব্যবহারের যখন সামর্থ্য না থাকে, তা পানি না পাওয়ার জন্য হোক কিংবা কোন রোগ-শোকের কারণে, তখন মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেয়াই পবিত্রতা ও অযুর পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যায়। পূর্ববতী উম্মতদের জন্য এ সুবিধা ছিল না। অতঃপর বললেনঃ আর পঞ্চমটি এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক রাসূলকে একটি দো'আ কবূল হওয়ার এমন নিশ্চয়তা দান করেছেন, যার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর প্রত্যেক নবী-রাসূলই তাদের নিজ নিজ দো'আকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়েছে। আমাকে তাই বলা হল যে, আপনি কোন একটা দো'আ করুন। আমি আমার দো'আকে আখেরাতের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছি। সে দো'আ তোমাদের জন্য এবং কেয়ামত পর্যন্ত لا إله إلا الله 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক মা'বুদ নেই' কালেমার সাক্ষ্য দানকারী যেসব লোকের জন্য হবে, তাদের কাজে লাগবে। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/২২২]

আবু মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে উদ্ধৃত বর্ণনায় আরো উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে শুনবে, তা সে আমার উম্মতদের মধ্যে হোক কিংবা ইয়াহূদী-নাসারা হোক, যদি সে আমার উপর ঈমান না আনে, তাহলে জাহান্নামে যাবে'। [মুসনাদে আহমাদঃ ২/৩৫০]

সারমর্ম এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য, প্রত্যেক দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য

وَالْأَرْضِ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ্ নেই; তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। কাজেই তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রাসূল উম্মী নবীর প্রতি যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর বাণীসমূহে ঈমান রাখেন। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।'

وَمِن قَوْمِ مُوسٰىٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾

১৫৯. আর মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দল রয়েছে যারা অন্যকে ন্যায়ভাবে পথ দেখায় ও সে অনুযায়ীই (বিচারে) ইনসাফ করে(১)।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপকভাবে রাসূল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর যে লোক তার প্রতি ঈমান আনবে না, সে লোক কোন সাবেক শরী'আত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোন ধর্ম ও মতের পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণভাবে করতে থাকা সত্ত্বেও কস্মিনকালেও মুক্তি পাবে না।

(১) এ আয়াতে সত্যনিষ্ঠ দল বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে-

এক. অধিকাংশ অনুবাদক এ আয়াতের অনুবাদ এভাবে করেছেন- "মূসার জাতির মধ্যে এমন একটি দল আছে যারা সত্য অনুযায়ী পথনির্দেশ দেয় এবং ইনসাফ করে"। অর্থাৎ তাদের মতে কুরআন নাযিল হবার সময় বনী-ইস্‌রাঈলীদের যে নৈতিক ও মানসিক অবস্থা বিরাজমান ছিল তারই কথা এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বিগত আয়াতসমূহে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের অসদাচরণ, কুটতর্ক এবং গোমরাহীর বর্ণনা ছিল। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিটাই এমন নয়; বরং তাদের মধ্যে কিছু লোক ভালও রয়েছে যারা সত্যানুসরণ করে এবং ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে। এরা হল সেসব লোক, যারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের যুগে সেগুলোর হেদায়াত অনুযায়ী আমল করত এবং যখন খাতামুন্নাবিয়্যীন সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়, তখন তাওরাত ও ইঞ্জীলের সুসংবাদ অনুসারে তার উপর ঈমান আনে এবং তার যথাযথ অনুসরণও করে। বনী-ইস্‌রাঈলদের এই সত্যনিষ্ঠ দলটির উল্লেখও কুরআনুল

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ۚ
وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗٓ اَنِ
اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا
عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ
وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ
الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۗ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا
رَزَقْنٰكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْٓا
اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

১৬০. আর তাদেরকে আমরা বারটি গোত্রে বিভক্ত করেছি। আর মূসার সম্প্রদায় যখন তার কাছে পানি চাইল, তখন আমরা তার প্রতি ওহী পাঠালাম, ‘আপনার লাঠির দ্বারা পাথরে আঘাত করুন’; ফলে তা থেকে বারটি ঝর্ণা ধারা উৎসারিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান চিনে নিল। আর আমরা মেঘ দ্বারা তাদের উপর ছায়া দান করেছিলাম এবং তাদের উপর আমরা মান্না ও সালওয়া নাযিল করেছিলাম। (বলেছিলাম) ‘তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু খাও।’ আর তারা আমাদের প্রতি কোন যুলুম করেনি, বরং তারা নিজদের উপরই যুলুম করত।

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ
وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا

১৬১. আর স্মরণ করুন, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, ‘তোমরা এ জনপদে বাস কর ও যেখানে খুশি খাও এবং

কারীমে বারংবার করা হয়েছে। যেমন, সূরা আলে-ইমরানঃ ১১৩, ১৯৯, সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১২১, সূরা আল-ইস্‌রাঃ ১০৭-১০৯, সূরা আল-কাসাসঃ ৫২-৫৪। [ইবন কাসীর]

দুই. পূর্বাপর আলোচনা বিশ্লেষণ করে কোন কোন মুফাস্‌সির এ মত দিয়েছেন যে, এখানে মূসার সময় তথা বনী-ইস্‌রাঈলীদের যে অবস্থা ছিল তারই কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে এ বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ জাতির মধ্যে যখন বাছুর পূজার অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার উপর পাকড়াও করা হয় তখন সমগ্র জাতি গোমরাহ ছিল না; বরং তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তখনো সৎ ছিল। [তাবারী; ইবন কাসীর] মোটকথা, আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, মূসা ‘আলাইহিস্ সালামের সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা সব সময়ই সত্যে সুদৃঢ় ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সংবাদ শুনে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তারাই হোক অথবা মূসার যুগে যারা হকপন্থী ছিল তারা। যারা গো-বাছুর পূজা করেনি বা নবীদেরকে হত্যা করেনি।

حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ
خَطِيْٓـٰٔتِكُمْ ؕ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٦١﴾

বল, ‘ক্ষমা চাই’ । আর নতশিরে দরজা দিয়ে প্রবেশ কর; আমরা তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করব । অবশ্যই আমরা মুহসিনদেরকে বাড়িয়ে দেব ।’

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ
الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا
يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٢﴾

১৬২. অতঃপর তাদের মধ্যে যারা যালিম ছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল । কাজেই আমরা আসমান থেকে তাদের প্রতি শাস্তি পাঠালাম, কারণ তারা যুলুম করত ।

একুশতম রুকূ‘

وَسْـَٔلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ كَانَتْ
حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ۘ اِذْ يَعْدُوْنَ فِي السَّبْتِ اِذْ
تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا
وَّيَوْمَ لَا يَسْبِتُوْنَ ۙ لَا تَاْتِيْهِمْ ۛ كَذٰلِكَ ۛ
نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿١٦٣﴾

১৬৩. আর তাদেরকে সাগর তীরের জনপদবাসী(১) সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করুন, যখন তারা শনিবারে সীমালংঘন করত; যখন শনিবার পালনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের কাছে আসত । কিন্তু যেদিন তারা শনিবার পালন করত না, সেদিন তা তাদের কাছে আসত না । এভাবে আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করতাম, কারণ তারা ফাসেকী করত ।

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا ۙ اللّٰهُ
مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ قَالُوْا
مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٦٤﴾

১৬৪. আর স্মরণ করুন, যখন তাদের একদল বলেছিল, ‘আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন?’ তারা বলেছিল, ‘তোমাদের রবের কাছে দায়িত্ব-মুক্তির জন্য এবং

---

(১) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ জনপদটি সাগর তীরে ছিল । মদীনা ও মিশরের মাঝামাঝি । যাকে ‘আইলা’ বলা হত । [তাবারী] বর্তমানে এটাকে ‘ঈলাত’ বলা হয় । [আত-তাফসীরুস সহীহ]

যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে, এজন্য।’

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِۦٓ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوٓءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

১৬৫. অতঃপর যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, তখন যারা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করত তাদেরকে আমরা উদ্ধার করি। আর যারা যুলুম করেছিল তাদেরকে আমরা কঠোর শাস্তি দেই, কারণ তারা ফাসেকী করত(১)।

---

(১) এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ জনপদে তিন ধরনের লোক ছিল। এক, যারা প্রকাশ্যে ও পূর্ণ ঔদ্ধত্য সহকারে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করছিল। দুই, যারা নিজেরা বিরুদ্ধাচারণ করছিল না কিন্তু অন্যের বিরুদ্ধাচারণকে নীরবে হাত পা গুটিয়ে বসে বসে দেখছিল এবং উপদেশ দানকারীদের বলছিল, এ হতভাগাদের উপদেশ দিয়ে কী লাভ? তিন, যারা ঈমানী সম্ভ্রমবোধ ও মর্যাদাবোধের কারণে আল্লাহর আইনের এহেন প্রকাশ্য অমর্যাদা বরদাশত করতে পারেনি এবং তারা এ মনে করে সৎকাজের আদেশ দিতে ও অসৎকাজ থেকে অপরাধীদেরকে বিরত রাখতে তৎপর ছিল যে, হয়তো ঐ অপরাধীরা তাদের উপদেশের প্রভাবে সৎপথে এসে যাবে, আর যদি তারা সৎপথে নাও আসে তাহলে অন্তত নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী কর্তব্য পালন করে তারা আল্লাহর সামনে নিজেদের দায়মুক্তির প্রমাণ পেশ করতে পারবে। [ইবন কাসীর] এ অবস্থায় এ জনপদের উপর যখন আল্লাহর আযাব নেমে এলো, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী তখন এ তিনটি দলের মধ্য থেকে তৃতীয় দলটিকেই বাঁচিয়ে নেয়া হয়েছিল আর যারা অপরাধ করেছিল তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দলটি, যারা অন্যায় করেনি তবে অন্যায় থেকে নিষেধ করেনি তাদের সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কারণ তারা ভাল কিংবা মন্দ কিছুই করেনি যে, তাদের কথা আলোচনায় আসবে। [ইবন কাসীর] এমতাবস্থায় দ্বিতীয় দলটির পরিণতি কেমন হয়েছিল তাদের সম্পর্কে তাফসীরবিদদের দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়। ইবন আব্বাস থেকে এক সহীহ বর্ণনায় এসেছে যে, একমাত্র তারাই আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল, যারা অন্যায় করেছিল। আর বাকী দু'টি দল যারা বলেছিল যে, “আল্লাহ্ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন?” আর যারা বলেছিল “তোমাদের রবের কাছে দায়িত্ব-মুক্তির জন্য” আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উভয় দলকেই শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ]

কোন কোন তাফসীরবিদ, যারা অন্যায় করেনি তবে অন্যায় থেকে নিষেধও করেনি তাদেরকেও শাস্তির সম্মুখীন হয়েছে বলে মনে করেন। এ বর্ণনাটিও ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। [ইবন কাসীর] তবে ইবন কাসীর প্রথম

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (١٦٦)

১৬৬. অতঃপর তারা যখন নিষিদ্ধ কাজ বাড়াবাড়ির সাথে করতে লাগল তখন আমরা তাদেরকে বললাম, 'ঘৃণিত বানর হও!'

মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ শেষোক্ত মতের পক্ষের লোকরা বলেন, কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, সামষ্টিক অপরাধের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা একই ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [সূরা আল-আনফালঃ ২৫] অর্থাৎ সেই বিপর্যয় থেকে বেঁচে থাক যার কবলে বিশেষভাবে কেবলমাত্র তোমাদের মধ্য থেকে যারা যুলুম করেছে তারাই পড়বে না। হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'মহান আল্লাহ বিশেষ লোকদের অপরাধের দরুন সর্বসাধারণকে শাস্তি দেন না, যতক্ষণ সাধারণ লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে না পৌঁছে যায় যে, তারা নিজেদের চোখের সামনে খারাপ কাজ হতে দেখে এবং তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশের ক্ষমতাও রাখে এরপরও কোন অসন্তোষ প্রকাশ করে না। কাজেই লোকেরা যখন এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন আল্লাহ সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সবাইকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন'। [আবু দাউদ:৪৩৩৮; তিরমিযী: ২১৬৮; ইবন মাজাহ্: ৪০০৫: মুসনাদে আহমাদঃ ১/২] এ ছাড়াও আলোচ্য আয়াত থেকে একথাও জানা যায় যে, এ জনপদের উপর দুই পর্যায়ে আল্লাহর আযাব নাযিল হয়। প্রথম পর্যায়ে নাযিল হয় কঠিন শাস্তি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে যারা নাফরমানী অব্যাহত রেখেছিল তাদেরকে বানরে পরিণত করা হয়। [ফাতহুল কাদীর] দৃশ্যতঃ প্রথম পর্যায়ের আযাবে উভয় দলই শামিল ছিল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের আযাব দেয়া হয়েছিল কেবলমাত্র প্রথম দলকে।

কিন্তু আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বিশুদ্ধ বর্ণনা ও তাফসীরবিদদের অধিকাংশের মত হচ্ছে যে, দ্বিতীয় দলটিও শাস্তি থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ছিল। কারণ, তারা তো কোন যুলুম করেনি। আয়াতে শুধু যালেমদেরকেই শাস্তি দেয়ার কথা আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন। আরও একটি বিষয় এখানে জানা আবশ্যক যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা ফরযে কিফায়া। যদি কেউ সেটা করে তবে অন্যদের থেকে কর্তব্য আদায় হয়ে যায়। সুতরাং যারা নিষেধ করেছে, তারা চুপ থাকা লোকদের থেকে ফরযে কিফায়া আদায় করে দিয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় দলটি যে একেবারে চুপ ছিল তা নয়, তারা বলেছিল যে, 'আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন বা কঠোর শাস্তি দেবেন, তাদেরকে নসীহত করে কি লাভ?' এতে এক ধরণের ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। [সা'দী] সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, তারা সম্পূর্ণরূপে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা থেকে বিরত ছিল না। তাই তাদের উপর আযাব আসেনি এটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত।

১৬৭. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ঘোষণা করেন যে(১) অবশ্যই তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর এমন লোকদেরকে পাঠাবেন, যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে(২)। আর নিশ্চয় আপনার রব শাস্তি দানে তৎপর এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٧﴾

১৬৮. আর আমরা তাদেরকে যমীনে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছি(৩); তাদের কেউ

وَقَطَّعْنَٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ ٱلصَّٰلِحُونَ

---

(১) 'তাআযযানা' বাক্যাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, ঘোষনা দিয়ে জানিয়ে দেয়া। দুই, সুদৃঢ় ইচ্ছা এবং সে অনুসারে নির্দেশ। [ইবন কাসীর]

(২) আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে মূসা 'আলাইহিস্ সালামের অবশিষ্ট কাহিনী বিবৃত করার পর তার উম্মত অর্থাৎ ইয়াহূদীদের অসৎকর্মশীল লোকদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির বর্ণনা এসেছে। সে অনুসারে তাদের উপর শাস্তির ঘোষণা খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে প্রায় প্রতিটি গ্রন্থে দেয়া হয়েছে। এমনকি ঈসা আলাইহিসসালামও তাদেরকে এ একই সতর্কবাণী শুনান। বিভিন্ন ইনজীল গ্রন্থে তাঁর একাধিক ভাষণ থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সবশেষে কুরআনুল কারীমেও এ কথাটিকে দৃঢ়ভাবে পূনর্ব্যক্ত করেছে। আর তা হল কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর এমন কোন ব্যক্তিকে অবশ্যই চাপিয়ে রাখতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনায় জড়িয়ে রাখবে। সুতরাং তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইয়াহূদীরা সবসময়ই সর্বত্র ঘৃণিত, পরাজিত ও পরাধীন অবস্থায় রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, মূসা আলাইহিস সালাম তাদের উপর সাত বছর বা তেরো বছর খাজনা আরোপ করেছিলেন। তারপর গ্রীক, কাশদানী, কালদানী নৃপতিরা তাদের উপর কঠোর শাস্তি নিয়ে আপতিত হয়েছিল। পরে বুখতানাসারের হাতে, তারপর নাসারাদের হাতে, তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। সবশেষে তারা দাজ্জালের সহযোগীরূপে বের হবে, তারপর দাজ্জাল যখন মারা পড়বে, তখন মুসলিমরা ঈসা আলাইহিস সালামকে সাথে নিয়ে তাদের হত্যা করবে। [দেখুন, বুখারীঃ ২৯২৫, ২৯২৬] [ইবন কাসীর]।

(৩) এ আয়াতে ইয়াহূদীদের উপর আরোপিত অন্য আরেক শাস্তির কথা বলা হয়েছে। তা হল, তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। কোথাও কোন এক দেশে তাদের সমবেতভাবে বসবাসের সুযোগ হয়নি। ﴿وَقَطَّعْنَٰهُمُ ٱثْنَتَىْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ﴾

وَمِنْهُمْ دُونَ ذٰلِكَ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ
وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿١٦٨﴾

কেউ সৎকর্মপরায়ণ আর কেউ অন্যরূপ(১)। আর আমরা তাদেরকে মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে(২)।

এর মর্মও তাই। قَطَّعْنَا শব্দটি تقطيع থেকে নির্গত। যার অর্থ খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়া। আর أُمَمًا হল أُمَّة এর বহুবচন। যার অর্থ দল বা শ্রেণী। এর মর্ম হল, আমি ইয়াহূদী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি। সুতরাং যেখানেই কেউ ঢুকবে সেখানে ইয়াহূদীদের কোন সম্প্রদায় দেখতে পাবে। [তাবারী]

(১) এ আয়াতে ইয়াহুদীদের শ্রেণী বিভাগ করে বলা হচ্ছেঃ ﴿مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ﴾ অর্থাৎ "এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সৎ এবং কিছু অন্য রকম।" "অন্য রকম" -এর মর্ম হল এই যে, কাফের দুস্কৃতকারী ও অসৎ লোক রয়েছে। অর্থাৎ ইয়াহূদীদের মধ্যে সবই এক রকম লোক নয়, কিছু সৎও আছে। [তাবারী; ইবন কাসীর] এর অর্থ, সেসব লোক, যারা তাওরাতের যুগে তাওরাতের নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য ও অনুশীলন করেছে। না তার হুকুমের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করেছে, আর না কোন রকম অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] এছাড়া এতে তারাও উদ্দেশ্য হতে পারেন, যারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তার আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছেন। অপরদিকে রয়েছে সে সমস্ত লোক, যারা তাওরাতকে আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিংবা তার আহ্কাম বা বিধি বিধানের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের আখেরাতকে পৃথিবীতে নিকৃষ্ট বস্তু-সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। [বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

(২) আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছেঃ "আমি ভাল-মন্দ অবস্থার দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেছি যেন তারা নিজেদের গর্হিত আচার-আচরণ থেকে ফিরে আসে।" "ভাল অবস্থার দ্বারা"-এর অর্থ হল এই যে, তাদেরকে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দান। আর "মন্দ অবস্থার দ্বারা"-এর অর্থ হয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সে অবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে তাদের উপর নেমে এসেছে, অথবা কোন কোন সময়ে তাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য। [তাবারী; ইবন কাসীর] সারমর্ম এই যে, মানব জাতির আনুগত্য ও ঔদ্ধত্যের পরীক্ষা করার দু'টিই প্রক্রিয়া। তাদের ব্যাপারে উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ইহূদী সম্প্রদায় এতদুভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাদের জন্য নেয়ামতের দুয়ার খুলে দিয়ে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন, তখন তারা বলতে শুরু করেছে, ﴿إِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ أَغْنِيَآءُ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্ হলেন ফকীর আর আমরা ধনী।" [সূরা আলে-ইমরানঃ ১৮১] আর তাদেরকে যখন দারিদ্র্য ও দুর্দশার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে, তখন বলতে শুরু করেছেঃ ﴿يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ﴾ অর্থাৎ "আল্লাহ্র হাত সংকুচিত হয়ে গেছে।" [সূরা আল-মায়েদাহ্ঃ ৬৪]

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٞ وَرِثُواْ ٱلۡكِتَٰبَ يَأۡخُذُونَ
عَرَضَ هَٰذَا ٱلۡأَدۡنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغۡفَرُ لَنَا وَإِن
يَأۡتِهِمۡ عَرَضٞ مِّثۡلُهُۥ يَأۡخُذُوهُۚ أَلَمۡ يُؤۡخَذۡ عَلَيۡهِم
مِّيثَٰقُ ٱلۡكِتَٰبِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ
وَدَرَسُواْ مَا فِيهِۗ وَٱلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَۚ
أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ١٦٩

১৬৯. অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়(১); তারা এ তুচ্ছ দুনিয়ার সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, ‘আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে(২) ।’ কিন্তু ওগুলোর অনুরূপ সামগ্রী তাদের কাছে আসলে তাও তারা গ্রহণ করে; কিতাবের অঙ্গীকার কি তাদের কাছ থেকে নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া বলবে

---

(১) মুজাহিদ বলেন, এখানে অযোগ্য উত্তরপুরুষ বলে নাসারাদের বোঝানো হয়েছে। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন কাসীর বলেন, এখানে ইয়াহূদী, নাসারাসহ পরবর্তী সবাই উদ্দেশ্য হতে পারে। [ইবন কাসীর] মুজাহিদ বলেন, দুনিয়ার যে বস্তুতেই তাদের চোখ পড়বে, সেটা হালাল কিংবা হারাম যাই হোক না কেন, তারা তাই গ্রহণ করে, তারপর ক্ষমার তালাশে থাকে। আবার যদি আগামী কাল অনুরূপ কিছু নজরে পড়ে সেটাও গ্রহণ করে। [তাবারী] সুদ্দী বলেন, তাদের মধ্যে কাউকে বিচারক নিয়োগ করা হলে সে ঘুষ খেয়ে বিচার করত, তখন তাদের ভাললোকেরা একত্র হয়ে বলল যে, এটা করা যাবে না এবং ঘুষও দেয়া যাবে না। কিন্তু পূণরায় তাদের কেউ কেউ ঘুষ খেতে আরম্ভ করে। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে বলতো যে, আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। তখন অন্যরা তাকে খারাপ বলত। তারপর এ বিচারকের পদচ্যুতি বা মৃত্যুর কারণে যদি অন্য কাউকেও নিয়োগ করা হতো, সেও ঘুষ খেত। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছে কিন্তু কিতাবের হুকুমের বিরোধিতা করেছে। দুনিয়ার যত নিকৃষ্ট কামাই আছে যেমন ঘুষ ইত্যাদি তা-ই তারা গ্রহণ করে। কারণ তাদের লোভ ও লালসা প্রচণ্ড। তারা গোনাহ্ করে, তারা জানে এ কাজটি করা গুণাহ। তবুও এ আশায় তারা এ কাজটি করে যে, কোন না কোনভাবে তাদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। কারণ তারা মনে করে, তারা আল্লাহর প্রিয়পাত্র এবং তারা যত কঠিন অপরাধই করুক না কেন তাদের ক্ষমালাভ অপরিহার্য। এ ভুল ধারণার ফলে কোন গুনাহ করার পর তারা লজ্জিত হয় না এবং তাওবাও করে না। বরং একই ধরনের গোনাহ্ করার সুযোগ এলে তারা তাতে জড়িয়ে পড়ে। তারপর আবার যদি তাদের কাছে দুনিয়ার কোন ভোগ এসে যায়, তা যত হারামই হোক তা গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। বরং তা বারবার করতে থাকে। [মুয়াসসার]

না[১]? অথচ তারা এতে যা আছে তা অধ্যয়নও করে[২]। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের আবাসই উত্তম; তোমরা কি এটা অনুধাবন কর না?

وَالَّذِيۡنَ يُمَسِّكُوۡنَ بِالۡكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيۡعُ اَجۡرَ الۡمُصۡلِحِيۡنَ ﴿۱۷۰﴾

১৭০. যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারন করে ও সালাত কায়েম করে, আমরা তো সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না[৩]।

---

(১) অর্থাৎ তারা নিজেরাই জানে যে, আল্লাহ কখনো তাদেরকে একথা বলেননি এবং তাদের নবীগণও কখনো তাদেরকে এ ধরণের নিশ্চয়তা দেননি যে, তোমরা যা ইচ্ছা করতে পারো, তোমাদের সকল গুনাহ অবশ্যি মাফ হয়ে যাবে। তাছাড়া আল্লাহ নিজে যে কথা কখনো বলেননি তাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করার কি অধিকারই বা তাদের থাকতে পারে? অথচ তাদের কাছ থেকে অংগীকার নেয়া হয়েছিল যে, আল্লাহর নামে কোন অসত্য কথা তারা বলবে না। তাওরাত কায়েম করবে, সে অনুযায়ী আমল করবে। কুরআনের অন্যত্র তাদের এ অঙ্গীকারটি বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এসেছে, “স্মরণ করুন, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন: ‘অবশ্যই তোমরা তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।’ এরপরও তারা তা তাদের পেছনে ফেলে রাখে (অগ্রাহ্য করে) ও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে; কাজেই তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট!” [সূরা আলে ইমরান: ১৮৭] কিন্তু তারা কিতাবের বিধান জানার পরও সেটাকে নষ্ট করে দেয়, তা অনুসারে আমল করে না। এভাবে তারা আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে। [মুয়াসসার]

(২) অর্থাৎ এমন নয় যে, তারা বুঝে না। তারা আল্লাহ্র কিতাব অধ্যয়ণ করে, তারা জানে যে, তাদেরকে এ ধরনের হারাম বস্তু গ্রহণ করা থেকে তাদের কিতাবে নিষেধ করা হয়েছে। এমন নয় যে, তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তা করছে। বস্তুত: তাদের কোন সন্দেহ নেই। তারা জেনে-বুঝেই এ অন্যায় করছে। এটা নিঃসন্দেহে খারাপ কাজ। [সা'দী]

(৩) পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে একটি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা বিশেষতঃ বনী-ইস্রাঈলের আলেম সম্প্রদায়ের নিকট থেকে তাওরাত সম্পর্কে নেয়া হয়েছিল যে, এতে কোন রকম পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করবে না এবং সত্য ও সঠিক বিষয় ছাড়া মহান রবের প্রতি অন্য কোন বিষয় আরোপ করবে না। আর এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখিত হয়ে গিয়েছিল যে, বনী-ইস্রাঈলের আলেমগণ

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে তাওরাতের বিধি-বিধানের পরিবর্তন করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাতলিয়েছে। এখানে আলোচ্য এই আয়াতটিতে সে বর্ণনারই উপসংহার হিসাবে বলা হয়েছে যে, বনী-ইস্‌রাঈলের সব আলেমই এমন নয়; কোন কোন আলেম এমনও রয়েছে যারা তাওরাতের বিধি-বিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সৎকাজেও নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে। আর যথারীতি সালাতও প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনি লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে- আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দেন না, যারা নিজেদের সংশোধন করে। কাজেই যারা ঈমান ও আমলের উভয় ফরয আদায়ের মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের প্রতিদান বা প্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না। এ আয়াতে কয়েকটি লক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে-

প্রথমতঃ কিতাব বলতে এতে সে কিতাবই উদ্দেশ্য যার আলোচনা ইতোপূর্বে এসেছে। অর্থাৎ তাওরাত। অর্থাৎ যারা তাদের কিতাবে যে নবীর কথা বলা হয়েছে সে অনুসারে ঈমান এনেছে। মুজাহিদ বলেন, এ অনুসারে এটি আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর] আর এও হতে পারে যে, এতে কুরআনকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যারা বর্তমান নাযিলকৃত কিতাবের অনুসরণ করে তাদের প্রচেষ্টা ও আমল নষ্ট হবার নয়। তখন উম্মতে মুহাম্মাদীই উদ্দেশ্য হবে। [বাগভী; জালালাইন; সা'দী] অথবা সমস্ত আসমানী কিতাবই উদ্দেশ্য। তখন অর্থ হবে, যাদেরকেই আমরা কিতাব দিয়েছি তারা যদি তাদের সময়কার কিতাব অনুসারে চলে আমরা তাদের কর্মকাণ্ড ও আমল নষ্ট করি না। আর বর্তমানে কুরআন অনুসারেই সকলকে চলতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌র কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে। তাতে যত হুকুম-আহকাম আছে তারা সেটার উপর যত্ন সহকারে আমল করে, এ ব্যাপারে তাদের কোন শৈথিল্য হয় না। যাদের আমল বিনষ্ট হয় না। তাদের পরিচয় হচ্ছে যে, তারা কঠোরভাবে এ কিতাবে বর্ণিত শরী'আতের উপর আমল করে। [আইসারুত তাফাসীর] সুতরাং একান্ত আদব ও সম্মানের সাথে অতি যত্ন সহকারে নিজের কাছে শুধু রেখে দিলেই তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; বরং তার বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীর অনুবর্তীও হতে হবে।

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষয় হল, এখানে একটিমাত্র বিধান সালাত প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেই ক্ষান্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বিধান হল সালাত। [সা'দী] তদুপরি সালাতের অনুবর্তিতা আসমানী বিধানসমূহের অনুবর্তিতার বিশেষ লক্ষণ। এরই মাধ্যমে চেনা যায়, কে কৃতজ্ঞ আর কে কৃতঘ্ন। আর এর নিয়মানুবর্তিতার একটা বিশেষ কার্যকারিতাও রয়েছে যে, যে লোক সালাতে নিয়মানুবর্তী হয়ে যাবে, তার জন্য অন্যান্য বিধি-বিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সহজ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۚ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧١﴾

১৭১. আর স্মরণ করুন, যখন আমরা পর্বতকে তাদের উপরে উঠাই, আর তা ছিল যেন এক শামিয়ানা। তারা মনে করল যে, সেটা তাদের উপর পড়ে যাবে(১)। (বললাম,) ‘আমরা যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা তাক্‌ওয়ার অধিকারী হও।’

বাইশতম রুকূ‘

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৭২. আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব আদম-সন্তানের পিঠ থেকে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি(২)

যে লোক সালাতের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী নয়, তার দ্বারা অন্যান্য বিধি-বিধানের নিয়মানুবর্তিতাও সম্ভব হয় না। সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘সালাত হল দ্বীনের স্তম্ভ’, [তিরমিযীঃ ২৬১৬] অর্থাৎ যার উপরে তার ইমারত রচিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এই স্তম্ভকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে, যে এ স্তম্ভকে বিধ্বস্ত করেছে, সে গোটা দ্বীনের ইমারতকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। যে সালাতের ব্যাপারে গাফলতি করে, সে যত তাস্‌বীহ্-ওযীফাই পড়ুক কিংবা যত প্রচেষ্টা করুক না কেন, আল্লাহ্‌র নিকট সে কিছুই নয়।

(১) অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা‘আলা সেটা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, “আর তাদের অংগীকার গ্রহণের জন্য ‘তূর’ পর্বতকে আমরা তাদের উপর উত্তোলন করেছিলাম” [সূরা আন-নিসা: ১৫৪] ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, বনী-ইসরাঈলদেরকে যখন তাওরাত দেয়া হলো, তারা সেটা গ্রহণ করতে দ্বিধা করতে লাগল। তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তূর পাহাড়কে সমূলে সামিয়ানার মত তাদের উপর তুলে ধরলেন এবং বললেন, যা দেয়া হয়েছে সেগুলোকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করার ঘোষণা দাও, নতুবা তোমাদের উপর ছেড়ে দেব। [তাবারী] কোন কোন বর্ণনায় এসেছে তখন তারা সিজদায় পতিত হয়। তবে তারা তাদের বাম চক্ষুর পার্শ্বে সিজদা করে অপর চক্ষু দিয়ে উপরের দিকে তাকাতে থাকে। এখনও প্রত্যেক ইয়াহূদী অনুরূপ সিজদা করে থাকে। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতগুলোতে মহা প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে যা স্রষ্টা ও

إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۙ﴿١٧٢﴾

গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই(১)?' তারা বলেছিল,

সৃষ্টি এবং দাস ও মনিবের মাঝে সে সময় হয়েছিল, যখন এই পৃথিবীতে কোন সৃষ্টি আসেওনি। যাকে বলা হয় "প্রাচীন অঙ্গীকার"। কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াতে বহু প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। নবী-রাসূলগণের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত রিসালাতের বাণীসমূহ অবশ্যই উম্মতকে পৌঁছে দেন। এতে যেন কারো ভয়-ভীতি, মানুষের অপমান ও ভর্ৎসনার কোন আশংকাই তাদের জন্য অন্তরায় না হয়। আল্লাহ্র রাসূলগণ নিজেদের এই প্রতিশ্রুতির হক পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করেছেন। রিসালতের বাণী পৌঁছাতে গিয়ে তারা নিজেদের সবকিছু কুরবান করে দিয়েছেন। এমনিভাবে প্রত্যেক রাসূল ও নবীর উম্মতের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে যে, তারাও নিজ নিজ নবী-রাসূলের যথাযথ অনুসরণ করবে। তারপর প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এবং বিশেষভাবে সেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে নিজের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যয় করার জন্য- যা কেউ পূরণ করেছে, কেউ করেনি। এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হলো সে প্রতিশ্রুতি, যা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সমস্ত নবী-রাসূলগণের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে যে, তারা 'নবীয়ে-উম্মী', খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবেন। আর যখনই সুযোগ পাবেন, তাকে সাহায্য-সহায়তা করবেন। যার আলোচনা সূরা আলে ইমরানের ৮১ নং আয়াতে করা হয়েছে। আবার বনী-ইস্রাঈলদের কাছ থেকেও তাওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল। সূরা আল-আ'রাফের বিগত আয়াতগুলোয় সে বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সেই বিশ্বজনীন প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করছেন, যা সমস্ত আদমসন্তানের কাছ থেকে এই দুনিয়ায় আসারও পূর্বে সৃষ্টিলগ্নে তিনি নিয়েছিলেন। যা সাধারণ ভাষায় 'প্রাচীন অঙ্গীকার' বলে প্রসিদ্ধ।

(১) পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের তাফসীরে দু'টি প্রসিদ্ধ মত বর্ণিত হয়েছে। এক, এখানে যে অঙ্গীকার নেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তা ফিতরাত বা স্বভাবজাত দ্বীনের উপর মানুষকে সৃষ্টি করা, যাতে তারা কোন প্রকার পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত না হলে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাসী হতো, এ বিষয়টিকে বুঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ্র প্রশ্ন ও মানবজাতির প্রত্যুত্তর সবই অবস্থাভিত্তিক। অর্থাৎ তাদের মুখ দিয়ে কথা বের হয়নি। তাদের অবস্থাই একথার স্বীকৃতি দিচ্ছিল যে, তারা আল্লাহ্র রবুবিয়াতে পূর্ণ বিশ্বাসী। এ মতের সমর্থনে ঐ সমস্ত আয়াত ও হাদীস পেশ করা যায় যাতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে ফিতরাত বা স্বভাবজাত দ্বীন ইসলামের উপর সৃষ্টি করেছেন তারপর তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে ইয়াহূদী বা নাসারা বা মাজুসী বানিয়েছে। শয়তান তাদেরকে দ্বীন

থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সত্যনিষ্ঠ আলেমদের এক বিরাট দল এ মতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম, ইবন কাসীর, ইবন আবুল ইযয আল হানাফী, আব্দুর রহমান আস-সা'দী রাহিমাহুমুল্লাহ্ সহ আরো অনেকে।

দুই, আল্লাহ্ তা'আলা আদম 'আলাইহিস্ সালামের পিঠ থেকে তার সন্তানদেরকে বের করে তাদের কাছ থেকে তিনি মৌখিক অঙ্গীকার নিয়েছেন। এ মতের সপক্ষে বাহ্যিকভাবে আলোচ্য আয়াত, সূরা আল-বাকারার ২৭ এবং সূরা আল-হাদীদের ৮ নং আয়াতকে তারা তাদের দলীল হিসাবে পেশ করেন। এ ছাড়াও এ মতের সমর্থনে বেশ কিছু হাদীস, সাহাবা-তাবেয়ীনদের উক্তি এবং মুফাসসেরীনদের মতামত রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসের বর্ণনায় সৃষ্টিলগ্নের এই প্রতিশ্রুতির আরো কিছু বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। কিছু লোক উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তার কাছে যে উত্তর আমি শুনেছি তা হল এই- "আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আদম 'আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করেন। তারপর নিজের হাত যখন তার পিঠে বুলিয়ে দিলেন, তখন তার ঔরসে যত সৎমানুষ জন্মাবার ছিল তারা সব বেরিয়ে এল। তখন তিনি বললেনঃ এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জান্নাতেরই কাজ করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার তার পিঠে হাত বুলালেন। তখন যত পাপী-তাপী মানুষ তার ঔরসে জন্মাবার ছিল, তাদেরকে বের করে আনলেন এবং বললেনঃ এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জাহান্নামে যাবার মতই কাজ করবে"। সাহাবীগণের মধ্যে একজন নিবেদন করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, প্রথমেই যখন জান্নাতী ও জাহান্নামী সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে, তখন আর আমল করানো হয় কি উদ্দেশ্যে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ "যখন আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে জান্নাত বাসের কাজই করতে শুরু করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কাজের ভেতরেই হয়, যা জান্নাতবাসীদের কাজ। আর আল্লাহ্ যখন কাউকে জাহান্নামের জন্য তৈরী করেন, তখন সে জাহান্নামের কাজই করতে আরম্ভ করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কোন কাজের মাধ্যমেই হয়, যা জাহান্নামের কাজ"। [মুয়াত্তাঃ ২/৮৯৮, মুসনাদে আহমাদঃ ১/৪৪, আবু দাউদঃ ৪৭০৩, তিরমিযীঃ ৩০৭৫, মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ১/২৭, ২/৩২৪, ৫৪৪]। অর্থাৎ মানুষ যখন জানে না যে, সে কোন শ্রেণীভুক্ত, তখন তার পক্ষে নিজের সামর্থ্য, শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা জান্নাতবাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য যে, সেও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ছাড়া অন্য বর্ণনায় এসেছে, প্রথমবারে যারা আদম 'আলাইহিস্ সালামের ঔরস থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা ছিল শ্বেতবর্ণ-যাদেরকে বলা হয়েছে জান্নাতবাসী। আর দ্বিতীয়বার যারা বেরিয়েছিল তারা ছিল

'হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রইলাম।' এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম(১)।'

أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৩. কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদের পিতৃপুরুষরাও তো আমাদের আগে শির্ক করেছে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি (শির্কের মাধ্যমে) যারা তাদের আমলকে বাতিল করেছে তাদের কৃতকর্মের জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন(২)?'

কৃষ্ণবর্ণ- যাদেরকে জাহান্নামবাসী বলা হয়েছে। [দেখুন, মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৪৪১] অপর এক বর্ণনায় এ কথাও রয়েছে যে, এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জন্মানোর মত যত আদমসন্তান বেরিয়ে এল, তাদের সবার ললাটে একটা বিশেষ ধরনের দীপ্তি ছিল। [দেখুন, তিরমিযী: ৩০৭৬, মুস্তাদরাকে হাকেম: ২/২৮৬]। অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, মহান আল্লাহ্ সবচেয়ে অল্প আযাবে লিপ্ত জাহান্নামবাসীকে জিজ্ঞাসা করবেন, যদি দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব তোমার হয় তাহলে কি তুমি এ আযাবের বিনিময় হিসাবে দিতে? সে বলবে, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমার কাছে তার থেকেও সামান্য জিনিস চেয়েছিলাম, যখন তুমি আদমের পিঠে ছিলে, তা হল, আমার সাথে শির্ক কর না। কিন্তু তুমি শির্ক ছাড়া কিছু করলে না। [বুখারী: ৩৩৩৪; মুসলিম: ২৮০৫]

(১) এ স্বীকারোক্তি আমি এ কারণে গ্রহণ করেছি যাতে তোমরা কেয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সৃষ্টিলগ্নে তোমাদের অন্তরে ঈমানের মূল এমনিভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে যে, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনকে পালনকর্তা স্বীকার না করে কোন অব্যাহতি থাকবে না। [ইবন কাসীর]

(২) এ আয়াতে অঙ্গীকার নেয়ার আরেকটি কারণ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ অঙ্গীকার আমি এ জন্যও গ্রহণ করেছি, আবার না তোমরা কেয়ামতের দিন এমন কোন ওযর-আপত্তি করতে থাক যে, শির্ক ও পৌত্তলিকতা তো আসলে আমাদের বড়রা অবলম্বন করেছিল, আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরের বংশধর। আমরা তো খাঁটি-অখাঁটি ভুল-শুদ্ধ কোনটাই জানতাম না। কাজেই বড়রা যা কিছু করেছে, আমরাও তাই করেছি। অতএব, বড়দের শাস্তি আমাদেরকে দেয়া হবে কেন? আল্লাহ্ তা'আলা বাতলে দিয়েছেন যে, অন্যের শাস্তি তোমাদেরকে দেয়া হয়নি বরং স্বয়ং তোমাদেরই

১৭৪. আর এভাবে আমরা নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করি যাতে তারা ফিরে আসে(১)।

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ وَلَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ١٧٤

১৭৫. আর তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনান(২) যাকে আমরা দিয়েছিলাম নিদর্শনসমূহ, তারপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অতঃপর শয়তান

وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيۡنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنۡهَا فَأَتۡبَعَهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ ١٧٥

শৈথিল্য ও গাফলতির শাস্তি দেয়া হয়েছে। কারণ, সৃষ্টিলগ্নের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানবাত্মায় এমন এক বীজ রোপন করে দেয়া হয়েছিল যাতে সামান্য চিন্তা করলেই এটুকু বিষয় বুঝতে পারা কঠিন ছিল না যে, একজন স্রষ্টা রয়েছেন, আমাকে তাঁরই ইবাদত করা উচিত। [দেখুন, তাবারী; বাগভী; ফাতহুল কাদীর; মুয়াসসার]

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্‌র নিদর্শণাবলী বর্ণনার কারণ ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে যে, আমরা নিদর্শনগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যাতে মানুষ শৈথিল্য, গাফলতি ও অনাচার থেকে ফিরে আসে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে কেউ যদি সামান্য লক্ষ্যও করে, তাহলে সে সেই সৃষ্টিলগ্নের প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে আসতে পারে। অর্থাৎ একটু লক্ষ্য করলেই তারা শির্ক থেকে ফিরে আসবে এবং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের পালনকর্তা হওয়ার স্বীকৃতি দিতে শুরু করবে। তাঁর পথের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। [মুয়াসসার]

(২) এ আয়াতে কোন নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। মুফাসসিরগণ রাসূলের যুগের এবং তাঁর পূর্ববর্তী যুগের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে এ দৃষ্টান্তের লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু 'বাল'আম ইবন আবার' এর নাম নিয়েছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আবদুল্লাহ ইবন আমর নিয়েছেন উমাইয়া ইবন আবীসসালতের নাম। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস বলেন, এ ব্যক্তি ছিল সাইফী ইবনুর রাহেব। [ইবন কাসীর] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদাহরণ হিসেবে যে বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকা এখানে পেশ করা হয়েছে সে তো পর্দারন্তরালেই রয়ে গেছে। তবে যে ব্যক্তিই এ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে তার ব্যাপারে এ উদাহরণটি প্রযোজ্য হবেই। তবে বিখ্যাত ঘটনা হচ্ছে যে, তখনকার দিনে এক লোক ছিল যার দো'আ কবুল হত। যখন মূসা আলাইহিস সালাম শক্তিশালী লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হলেন। তখন লোকেরা তার কাছে এসে বলল, তোমার দো'আ তো কবুল হয়, সুতরাং তুমি মূসার বিরুদ্ধে দো'আ কর। সে বলল, আমি যদি মূসার বিরুদ্ধে দো'আ করি, তবে আমার দুনিয়া ও আখেরাত সবই যাবে। কিন্তু তারা তাকে ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত সে দো'আ করল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ কবুল হওয়ার সুযোগ রহিত করে দিলেন। [ইবন কাসীর]

তার পিছনে লাগে, আর সে বিপথ গামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى
الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ
تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ
مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ
فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٧٦﴾

১৭৬. আর আমরা ইচ্ছে করলে এর দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে যমীনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে(১) এবং তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মত; তার উপর বোঝা চাপালে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে এবং বোঝা না চাপালেও জিহ্বা বের করে হাঁপায়(২)।

---

(১) অর্থাৎ আমি ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের মাধ্যমে তাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম, দুনিয়ার পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি দিতে পারতাম।[ইবন কাসীর] কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঐ আয়াতসমূহ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হল প্রকৃত মর্যাদা ও উন্নতির কারণ। কিন্তু যে লোক এ সমস্ত আয়াতের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেবে, তার জন্য এই জ্ঞানই মহাবিপদ হয়ে যাবে।

(২) এখানে যে ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করা হয়েছে সে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানের অধিকারী ছিল। অর্থাৎ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত ছিল। এ ধরনের জ্ঞানের অধিকারী হবার কারণে যে কর্মনীতিকে সে ভুল বলে জানতো তা থেকে দূরে থাকা এবং যে কর্মনীতিকে সঠিক মনে করতো তাকে অবলম্বন করাই তার উচিত ছিল। এ যথার্থ জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করলে আল্লাহ্ তাকে মানবতার উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করতেন। কিন্তু সে দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ ও আরাম আয়েশের দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রবৃত্তির লালসার মুকাবিলা করার পরিবর্তে সে তার সামনে নতজানু হয়। উচ্চতর বিষয়সমূহ লাভের জন্য সে পার্থিব লোভ-লালসার ঊর্ধে উঠার পরিবর্তে তার মধ্যে এমনভাবে ডুবে যায় যার ফলে নিজের সমস্ত উচ্চতর আশা-আকাংখা, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উন্নতির সমস্ত সম্ভাবনা পরিত্যাগ করে বসে। ফলে শয়তান তার পেছনে লেগে যায় এবং অনবরত তাকে এক অধঃপতন থেকে আরেক অধঃপতনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে এ যালেম শয়তান তাকে এমন সব লোকের দলে ভিড়িয়ে দেয় যারা তার ফাঁদে পা দিয়ে বুদ্ধি বিবেক সব কিছু হারিয়ে বসেছিল।

এরপর আল্লাহ এ ব্যক্তির অবস্থাকে এমন একটি কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন যার জিভ সবসময় ঝুলে থাকে। তার উপর বোঝা থাকলেও হাঁপাতে থাকে। আর বোঝা না থাকলেও একই অবস্থায় হাঁপাতে থাকে। মুজাহিদ বলেন, এ উদাহরণ দিয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যে কিতাব পড়ে কিন্তু তার উপর আমল করে না। [তাবারী;

যে সম্প্রদায় আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করে তাদের অবস্থাও এরূপ। সুতরাং আপনি বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন যাতে তারা চিন্তা করে(১)।

আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এ উদাহরণটি কুকুরের জন্য এ উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছে যে, তাকে কোন জ্ঞান ও হিকমতের কথা বললে সে তা নেয়ার মত যোগ্যতা রাখে না। আর যদি তাকে কোন কিছু না দিয়ে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হয়, তবে কোন কল্যাণই বয়ে আনতে পারে না। যেমনিভাবে কুকুর বসে থাকলেও হাঁপাতে থাকে। আর দৌড়ালেও হাঁপায়। [তাবারী; আত-তাফসীরুস সহীহ] কারও কারও মতে আয়াতের অর্থ, সে তার পথভ্রষ্টতায় নিপতিত থাকা এবং ঈমানের দিকে আহ্বান জানানো হলে তা দ্বারা উপকৃত না হওয়ার দিক থেকে কুকুরের মত। তার উপর বোঝা চাপলেও সে হাঁপায়, না চাপলেও হাঁপায়। অনুরূপভাবে এ লোকটি উপদেশ ও ঈমানের প্রতি দাওয়াত দ্বারা উপকৃত হয়নি। অন্য আয়াতে যেমন বলা হয়েছে, “যারা কুফরী করেছে আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তারা ঈমান আনবে না।” [সূরা আল-বাকারাহ: ৬] অন্য আয়াতে এসেছে, “আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করুন একই কথা; আপনি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে কখনই ক্ষমা করবেন না।” [সূরা আত-তাওবাহ: ৮০] অনুরূপ আরও আয়াতসমূহ। কারও কারও মতে, কাফের, মুনাফিক ও পথভ্রষ্টের অন্তর যেহেতু দুর্বল, হিদায়াতশূন্য থাকে সেহেতু সে খুব বেশী অস্থিরমতি। [ইবন কাসীর]

(১) উল্লেখিত আয়াতগুলোতে চিন্তা করলে যে শিক্ষা আমরা পাই তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলোঃ প্রথমতঃ কারো পক্ষেই নিজের জ্ঞান-গরিমা এবং ইবাদাত-বন্দেগীর ব্যাপারে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ, সময় বদলাতে এবং বিপরীতগামী হতে দেরী হয় না। ইবাদাত-বন্দেগীর সাথে সাথে আল্লাহ্‌র শোকরগোযারী ও তাতে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করা এবং তাঁর উপর ভরসা করা কর্তব্য। [কুরতুবী] দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ যে সমস্ত উদাহরণ পেশ করেছেন সেগুলোতে গবেষণা করলে জ্ঞান বাড়বে। আর জ্ঞান বাড়লে সেটা অনুযায়ী আমল করতে হবে। [সা'দী] তৃতীয়ত: আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণ স্বয়ং একটি আযাব এবং এর কারণে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে গিয়ে আরো হাজার রকমের মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। কাজেই যে লোককে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন, সাধ্যমত সে জ্ঞানের সম্মান দান এবং নিজ আমল সংশোধনের চিন্তা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত না থাকা তার একান্ত কর্তব্য। চতুর্থত: এমনসব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যাতে স্বীয় দ্বীনী ব্যাপারে ক্ষতির আশংকা থাকে। বিশেষ করে ধন-সম্পদ, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার ক্ষেত্রে সেই অশুভ পরিণতির কথা সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক।

১৭৭. সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত কত মন্দ! যারা আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করে। আর তারা নিজদের প্রতিই যুলুম করত।

سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮. আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত(১)।

مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْخَٰسِرُونَ ﴿١٧٨﴾

১৭৯. আর আমরা তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি(২); তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা তারা শুনে না; তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও বেশী বিভ্রান্ত। তারাই হচ্ছে গাফেল(৩)।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُولَٰٓئِكَ كَالْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْغَٰفِلُونَ ﴿١٧٩﴾

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেসবের উপর আপন নূরের জ্যোতি ফেললেন। যার উপর সে জ্যোতি পড়েছে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে আর যার উপর সে জ্যোতি পড়েনি সে পথভ্রষ্ট হবে। এজন্য আমি বলি, আল্লাহ্র জ্ঞানের উপর লিখে কলম শুকিয়ে গেছে।' [তিরমিযীঃ ২৬৪২]

(২) এর অর্থ এটা নয় যে, আমি বিনা কারণে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্যই সৃষ্টি করেছিলাম এবং তাদেরকে সৃষ্টি করার সময় এ সংকল্প করেছিলাম যে, তাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত করবো। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, আমি তো তাদেরকে হৃদয়, মস্তিষ্ক, কান, চোখ সবকিছুসহ সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু এ বেকুফরা এগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেনি এবং নিজেদের অসৎ কাজের বদৌলতে শেষ পর্যন্ত তারা জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তাদের আমলই তাদেরকে জাহান্নামের উপযুক্ত করেছে। তাদের জাহান্নাম দেয়া আল্লাহ্র ইনসাফের চাহিদা। সে হিসেবে তিনি যেহেতু আগে থেকেই জানেন যে, তারা জাহান্নামে যাবে, সুতরাং তাদেরকে যেন তিনি জাহান্নামের আগুনে শাস্তি দেয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। [ফাতহুল কাদীর]

(৩) আয়াতে বলা হয়েছেঃ এরা কিছুই বোঝে না, কোন কিছু দেখেও না এবং শুনেও না। অথচ বাস্তবে এরা পাগল বা উম্মাদ নয় যে, কিছুই বুঝতে পারে না। অন্ধও

১৮০. আর আল্লাহ্‌র জন্যই রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক⁽¹⁾; আর যারা

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا

নয় যে, কোন কিছু দেখবে না, কিংবা বধিরও নয় যে, কোন কিছু শুনবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে এরা পার্থিব বিষয়ে অধিকাংশ লোকের তুলনায় অধিক সতর্ক ও চতুর। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের যা বুঝা বা উপলব্ধি করা উচিত ছিল তারা তা করেনি, যা দেখা উচিত ছিল তা তারা দেখেনি, যা কিছু তাদের শুনা উচিত ছিল তা তারা শুনেনি। আর যা কিছু বুঝেছে, দেখেছে এবং শুনেছে, তা সবই ছিল সাধারণ জীবজন্তুর পর্যায়ের বুঝা, দেখা ও শুনা, যাতে গাধা-ঘোড়া, গরু-ছাগল সবই সমান। এ জন্যই উল্লেখিত আয়াতের শেষাংশে এসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ "এরা চতুস্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত", শুধুমাত্র শরীরের বর্তমান কাঠামোর সেবায় নিয়োজিত। খাদ্য আর পেটই হলো তাদের চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর। অতঃপর বলা হয়েছেঃ "এরা চতুস্পদ জীব-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট।" তার কারণ চতুস্পদ জীব-জানোয়ার শরী'আতের বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়- তাদের জন্য কোন সাজা-শাস্তি কিংবা দান-প্রতিদান নেই। তাদের লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র জীবন ও শরীর-কাঠামোতে সীমিত থাকে তবেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষকে যে স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সেজন্য তাদের সুফল কিংবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই এসব বিষয়কেই নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে সাব্যস্ত করে বসা জীবজন্তুর চেয়েও অধিক নিবুর্দ্ধিতা। তাছাড়া জীব-জানোয়ার নিজের প্রভূ ও মালিকের সেবা যথার্থই সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ না-ফরমান মানুষ স্বীয় মালিক, পালনকর্তার আনুগত্যে ত্রুটি করতে থাকে। সে কারণে তারা চতুস্পদ জানোয়ার অপেক্ষা বেশী নির্বোধ ও গাফেল। কাজেই বলা হয়েছে "এরাই হলো প্রকৃত গাফেল।" [দেখুন, তাবারী; ইবন কাসীর]

(১) আয়াতে বলা হয়েছে যে, "সব উত্তম নাম আল্লাহ্‌রই জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।" এখানে উত্তম নাম বলতে সে সমস্ত নামকে বুঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরকে চিহ্নিত করে। বলাবাহুল্য, কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ স্তর যার ঊর্ধ্বে আর কোন স্তর থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র মহান পালনকর্তা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্টির পক্ষে এই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। সে কারণেই আয়াতে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, এসব আসমাউল-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য লাভ করা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়; কাজেই এ বিষয়টি যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের কিছু আসমাউল-হুসনা রয়েছে এবং সে সমস্ত 'ইসম' বা নাম একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তার সাথেই নির্দিষ্ট, তখন আল্লাহ্‌কে যখনই ডাকবে এসব নামে ডাকাই কর্তব্য। 'দো'আ' শব্দের অর্থ হচ্ছে, ডাকা কিংবা আহ্বান করা। আর দো'আ শব্দটি কুরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হল আল্লাহ্‌র যিকির, প্রশংসা ও

তাসবীহ্-তাহ্লীলের সাথে যুক্ত। যা ইবাদাতগত দো'আ নামে খ্যাত। আর অপরটি হল নিজের অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি আর সকল জটিলতার নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। যাকে প্রার্থনাগত দো'আ বলা হয়। এ আয়াতে "দো'আ" শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যাপক। অতএব, আয়াতের মর্ম হল এই যে, হামদ, সানা, গুণ ও প্রশংসা, তাসবীহ্-তাহ্লীলের যোগ্যও শুধু তিনিই এবং বিপদাপদে মুক্তি দান আর প্রয়োজন মেটানোও শুধু তাঁরই ক্ষমতায়। কাজেই যদি প্রশংসা বা গুণগান করতে হয়, তবে তাঁরই করবে আর নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা বিপদমুক্তির জন্য ডাকতে হলে, সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে শুধু তাঁকেই ডাকবে, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে। আর ডাকার সে পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব আসমাউল-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ দ্বারা ডাকবে যা আল্লাহ্র নাম বলে প্রমাণিত।

বস্তুত: এ আয়াতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতি দো'আ প্রার্থনার বিষয়ে দুটি হেদায়াত বা দিক নির্দেশ লাভ করেছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্তাই প্রকৃত হামদ-সানা কিংবা বিপদমুক্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে ডাকার জন্য মানুষ এমন মুক্ত নয় যে, যে কোন শব্দে ইচ্ছা ডাকতে থাকবে, বরং আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহপরবশ হয়ে আমাদিগকে সেসব শব্দসমষ্টিও শিখিয়ে দিয়েছেন যা তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার উপযোগী। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার গুণ-বৈশিষ্ট্যের সব দিক লক্ষ্য রেখে তাঁর মহত্ত্বের উপযোগী শব্দ চয়ন করতে পারা মানুষের সাধ্যের ঊর্ধ্বে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে-কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আল্লাহ্ তা'আলার নিরানব্বইটি এমন নাম রয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি এগুলোকে আয়ত্ত করে নেয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' [বুখারীঃ ৬৪১০, মুসলিমঃ ২৬৭৭] এই নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও হাকেম সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সরাসরি সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়নি তাই সেগুলো নির্ধারনে কোন অকাট্য কিছু বলা যাবে না। আবার এটা জেনে নেওয়াও জরুরী যে, আল্লাহ্র নাম নিরানব্বইটিতেই সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহ্র নামের অসীলা দিয়ে দো'আ করা জরুরী। আল্লাহ্ স্বয়ং ওয়াদা করেছেনঃ "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব।" [সূরা গাফেরঃ ৬০] আরও বলেনঃ "যখন আহ্বানকারী আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই" [সূরা আল-বাকারাহ্ঃ ১৮৬] উদ্দেশ্যসিদ্ধি কিংবা জটিলতা বা বিপদমুক্তির জন্য দো'আ ছাড়া অন্য কোন পন্থা এমন নেই যাতে কোন না কোন ক্ষতির আশংকা থাকবে না এবং ফললাভ নিশ্চিত হবে। নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তদুপরি একটা নগদ লাভ হল এই যে, দো'আ যে একটি ইবাদাত তার সওয়াব দো'আকারীর আমলনামায় তখনই লেখা হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ 'দো'আই হল ইবাদাত।' [আবু দাউদঃ ১৪৭৯,

يَعْمَلُوْنَ ۝١٨٠

তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর(১); তাদের কৃতকর্মের ফল

তিরমিযীঃ ৩২৪৭] যে উদ্দেশ্যে মানুষ দো'আ করে অধিকাংশ সময় হুবহু সে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, যে বিষয়টিকে প্রার্থনাকারী নিজের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছিল, তা তার পক্ষে কল্যাণকর নয় বলে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে সে দো'আকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন, যা তার জন্য একান্ত উপকারী ও কল্যাণকর। আর আল্লাহ্র হামদ ও সানার মাধ্যমে যিক্‌র করা হল ঈমানের খোরাক। এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মানুষের মহব্বত ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায় ও তাতে সামান্য পার্থিব দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হলেও শীঘ্রই তা সহজ হয়ে যায়।

সেজন্যই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'যে লোক চিন্তা-ভাবনা, পেরেশানী কিংবা কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তার পক্ষে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়া উচিত। তাতে সমস্ত জটিলতা সহজ হয়ে যাবেঃ لٰا إِلَه إِلّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لٰا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمُ، لٰا إِلَه إِلّا اللهُ رَبُّ السَموات وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ ।' অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি মহান, সহনশীল। আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি আরশের মহান প্রতিপালক। আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইবাদতের যোগ্য মা'বূদ নেই, তিনি আসমান ও যমীনের প্রতিপালক এবং আরশের মহান প্রতিপালক। [বুখারীঃ ৬৩৪৫, মুসলিমঃ ২৭৩০] অন্য এক হাদীসে আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লাম ফাতেমা যাহ্‌রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বলেনঃ 'আমার ওসীয়তগুলো শুনে নিতে (এবং সেমতে আমল করতে) তোমার বাধা কিসে? সে ওসীয়তটি হল এই যে, সকাল-সন্ধ্যায় এই দো'আটি পড়ে নেবে' يٰا حَيُّ يٰا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِح لِي شَأْنِي كُلَّه ولٰا تكلْنِيْ إِلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ 'হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছূর ধারক! আমি আপনার রাহমাতের বিনিময়ে উদ্ধার কামনা করছি, আমার যাবতীয় ব্যাপার ঠিক করে দিন আর আমাকে আমার নিজের কাছে ক্ষনিকের জন্যও সোপর্দ করেন না'। [তিরমিযীঃ ৩৫২৪, অনুরূপ আবুদাউদঃ ৫০৯০] [সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ]

সারকথা হল এই যে, উল্লেখিত আয়াতের এ বাক্যে উম্মতকে দু'টি হেদায়াত দেয়া হয়েছে। একটি হল এই যে, যে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, যে কোন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহ্‌কেই ডাকবে। কোন সৃষ্টিকে নয়। অপরটি হল এই যে, তাঁকে সে নামেই ডাকবে যা আল্লাহ্ তা'আলার নাম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে; তার শব্দের কোন পরিবর্তন করবে না।

(১) আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছেঃ সে সমস্ত লোকের কথা ছাড়ুন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার আসমায়ে-হুসনার ব্যাপারে বাঁকা চাল অবলম্বন করে। তারা তাদের কৃত বাঁকামীর প্রতিফল পেয়ে যাবে। অভিধান অনুযায়ী 'ইলহাদ' অর্থ

অচিরেই তাদেরকে দেয়া হবে।

ঝুঁকে পড়া এবং মধ্যমপন্থা থেকে সরে পড়া। কুরআনের পরিভাষায় 'ইলহাদ' বলা হয় সঠিক অর্থ ছেড়ে তাতে এদিক সেদিকের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ জুড়ে দেয়াকে। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, আপনি এমন সব লোকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলুন, যারা আল্লাহ্ তা'আলার আসমায়ে-হুস্‌নার ব্যাপারে বক্রতা অর্থাৎ অপব্যাখ্যা ও অপবিশ্লেষণ করে।

আল্লাহ্‌র নামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির কয়েকটি পন্থাই হতে পারে। আর সে সমস্তই এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এমন কোন নাম ব্যবহার করা যা কুরআন-হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত নয়। সত্যনিষ্ঠ আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে কারুরই এমন কোন অধিকার নেই যে, যে যা ইচ্ছা নাম রাখবে কিংবা যে গুণে ইচ্ছা তাঁর গুণাগুণ প্রকাশ করবে। শুধুমাত্র সে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করাই আবশ্যক যা কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহ্ তা'আলার নাম কিংবা গুণ হিসেবে উল্লেখিত রয়েছে। যেমন, আল্লাহ্‌কে 'কারীম' বলা যাবে, কিন্তু 'ছখী' নামে ডাকা যাবে না। 'নূর' নামে ডাকা যাবে, কিন্তু জ্যোতি ডাকা যাবে না। কারণ, এই দ্বিতীয় শব্দগুলো প্রথম শব্দের সমার্থক হলেও কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি। বিকৃতি সাধনের দ্বিতীয় পন্থাটি হলো আল্লাহ্‌র যে সমস্ত নাম কুরআন-হাদীসে উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন নামকে অশোভন মনে করে বর্জন বা পরিহার করা। এতে সে নামের প্রতি বেআদবী বা অবজ্ঞা প্রদর্শন বুঝা যায়। বিকৃতির তৃতীয় পন্থা হলো আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত নাম অন্য কোন লোকের জন্য ব্যবহার করা। তবে এতে এই ব্যাখ্যা রয়েছে যে, আসমায়ে-হুসনাসমূহের মধ্যে কিছু নাম এমনও আছে যেগুলো স্বয়ং কুরআন ও হাদীসে অন্যান্য লোকের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। আর কিছু নাম রয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো জন্য ব্যবহার করার কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীসে নেই। যেসব নাম আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, সেসব নাম অন্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, রাহীম, রাশীদ, আলী, কারীম, আজীজ প্রভৃতি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো জন্য যেসব নামের ব্যবহার কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেগুলো একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই নির্দিষ্ট। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য এগুলোর ব্যবহার করাই উল্লেখিত 'ইল্‌হাদ' তথা বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত এবং না-জায়েয ও হারাম। যেমন, রাহ্‌মান, রায্‌যাক, খালেক, গাফ্‌ফার, কুদ্দুস প্রভৃতি। [সিফাতুল্লাহিল ওয়ারিদা ফিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ] তদুপরি এই নির্দিষ্ট নামগুলো যদি আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো ক্ষেত্রে কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় যে, যাকে এসব শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হচ্ছে তাকেই যদি খালেক কিংবা রায্‌যাক মনে করা হয়, তাহলে তা বড় শির্ক। আর বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত না হয়, শুধুমাত্র অমনোযোগিতা কিংবা না বুঝার দরুন কাউকে খালেক, রায্‌যাক, রাহ্‌মান বলে ডেকে থাকে, তাহলে তা যদিও কুফর নয়, কিন্তু শির্কীসুলভ শব্দ হওয়ার কারণে কঠিন পাপের কাজ বটে। [আশ-শির্ক ফিল কাদীম ওয়াল হাদীস]

১৮১. আর যাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা ন্যায়ভাবে পথ দেখায়(১) ও সে অনুযায়ীই (বিচারে) ইনসাফ করে।

وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ ع (١٨١)

তেইশতম রুকূ'

১৮২. আর যারা আমাদের নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপ করেছে, অচিরেই আমরা তাদেরকে এমনভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতেও পারবে না(২)।

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ج (١٨٢)

১৮৩. আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি; নিশ্চয় আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

وَأُمْلِى لَهُمْ ط إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ (١٨٣)

১৮৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের সাথী মোটেই উন্মাদ নন(৩); তিনি তো

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ط إِنْ هُوَ إِلَّا

---

(১) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে একদল আল্লাহ্‌র সুনির্দিষ্ট নির্দেশ আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আদেশকে বাস্তবায়ন করার জন্য সদা-সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। তাদেরকে কেউ মিথ্যারোপ করবে অথবা অপমান করবে তার পরোয়া তারা করবে না।' [বুখারীঃ ৭৪৬০, মুসলিমঃ ১০৩৭]

(২) অর্থাৎ দুনিয়াতে রিযিক ও জীবনোপকরণের ভাণ্ডার তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন। ফলে তারা মনে করবে যে, তারা যা করে চলছে তা গ্রহণযোগ্য। এভাবেই তারা প্রতারিত হতে থাকবে। অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করবেন। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও এসেছে, "অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমরা তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম; অবশেষে তাদেরকে যা দেয়া হল যখন তারা তাতে উল্লসিত হল তখন হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম; ফলে তখনি তারা নিরাশ হল। ফলে যালিম সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করা হল এবং সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌র জন্যই।" [সূরা আল-আন'আম: ৪৪-৪৫]

(৩) সাথী বলতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা এ ঘোষণা দিয়েছেন, "আর তোমাদের সাথী উন্মাদ নন" [আত-তাকওয়ীর: ২২] আরও বলেন, "বলুন, 'আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিঃ তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দু-দুজন অথবা এক-একজন করে

نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾

এক স্পষ্ট সতর্ককারী।

أَوَلَمْ يَنظُرُوا۟ فِى مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. তারা কি লক্ষ্য করে না, আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সম্পর্কে?(১) আর এর সম্পর্কেও যে, সম্ভবত তাদের নির্ধারিত সময় নিকটে এসে গিয়েছে, কাজেই এরপর তারা আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে?

দাঁড়াও, তারপর তোমরা চিন্তা করে দেখ---তোমাদের সাথীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তিনি তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী মাত্র” [সাবা: ৪৬] অর্থাৎ তিনি তাদের মধ্যেই জন্মলাভ করেন। তাদের মধ্যে বসবাস করেন। শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পদার্পন করেন। নবুওয়াত লাভের পূর্বে সমগ্র জাতি তাকে একজন অত্যন্ত শান্ত-শিষ্ট-ভারসাম্যপূর্ণ স্বভাব প্রকৃতি ও সুস্থ মন-মগজধারী মানুষ বলে জানতো। নবুওয়াত লাভের পর যে-ই তিনি মানুষের কাছে আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছাতে শুরু করলেন, অমনি তাকে পাগল বলা আরম্ভ হয়ে গেল। একথা সুস্পষ্ট, নবী হওয়ার আগে তিনি যেসব কথা বলতেন সেগুলোর জন্য তাকে পাগল বলা হয়নি বরং নবী হওয়ার পর তিনি যেসব কথা প্রচার করতে থাকেন সেগুলোর জন্য তাকে পাগল বলা হতে থাকে। তাই এখানে বলা হচ্ছে, তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে, যে কথাগুলো তিনি বলছেন তার মধ্যে কোন্‌টি পাগলামির কথা? কোন্ কথাটি অর্থহীন, ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক? যদি তারা চিন্তা করতো তাহলে তারা নিজেরাই বুঝতে পারতো যে, শিরকের মতবাদ খণ্ডন, তাওহীদের প্রমাণ, রবের বন্দেগীর দাওয়াত এবং মানুষের দায়িত্ব পালন ও জবাবদিহি সম্পর্কে তাদের সাথী তাদেরকে যা কিছু বুঝাচ্ছেন তা কোন পাগলের কথা নয়। তাঁর স্বভাব ও চরিত্র সবচেয়ে উন্নত। তার কথা সবচেয়ে সুন্দর। তিনি তো শুধু কল্যাণের দিকেই আহ্বান করেন। অন্যায় ও অকল্যাণ থেকেই শুধু নিষেধ করেন। [সা'দী]

(১) অর্থাৎ আমাদের আয়াতসমূহে মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীরা তারা কি আসমান ও যমীনে আল্লাহ্‌র রাজত্ব ও ক্ষমতা, এতদুভয়ে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে না? তাহলে তারা এর মাধ্যমে শিক্ষা নিতে পারত যে, এগুলো একমাত্র সে সত্ত্বার জন্য যার কোন দৃষ্টান্ত নেই, নেই কোন সমকক্ষ, ফলে তারা তাঁর উপর ঈমান আনত, তাঁর রাসূলকে সত্য বলে মানত। তাঁর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসত। তার জন্য সাব্যস্ত করা যাবতীয় শরীক ও মূর্তি থেকে নিজেদেরকে বিমুক্ত ঘোষণা করত। তাছাড়া তারা এটাও বুঝতে সক্ষম হতো যে, এভাবে তাদের জীবনের মেয়াদও ফুরিয়ে আসছে, তখন যদি কুফরি অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় তবে তাদের স্থান হবে আল্লাহ্‌র আযাবেই। [ইবন কাসীর]

مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِيْ
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٨٦﴾

১৮৬. আল্লাহ্ যাদেরকে বিপথগামী করেন তাদের কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেন(১)।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ۚ قُلْ اِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَآ اِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْـَٔلُوْنَكَ
كَاَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۚ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭. তারা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে (বলে) 'তা কখন ঘটবে'?(২) বলুন, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার রবেরই নিকট। শুধু তিনিই যথাসময়ে সেটার প্রকাশ ঘটাবেন; আসমানসমূহ ও যমীনে সেটা ভারী বিষয়(৩)। হঠাৎ করেই তা

---

(১) অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আর আল্লাহ্ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আপনার কিছুই করার নেই।" [সূরা আল-মায়েদাহ: ৪১] আরও বলেন, "বলুন, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর।' আর যারা ঈমান আনে না, নিদর্শনাবলী ও ভীতি প্রদর্শন এমন সম্প্রদায়ের কোন কাজে আসে না" [সূরা ইউনুস: ১০১]

(২) এ আয়াতগুলো নাযিলের পেছনে বিশেষ একটি ঘটনা কার্যকর ছিল। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, জাবাল ইবন আবি কুশাইর ও শামওয়াল ইবন যায়দ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লামের নিকট ঠাট্টা ও বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনি কেয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে মানুষকে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন- এ ব্যাপারে যদি আপনি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট করে বলুন, কেয়ামত কোন সালের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে তো আমরাও জানি। এ ঘটনার ভিত্তিতেই আয়াতটি নাযিল হয়। [তাবারী]

(৩) এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে, এক. কিয়ামতের জ্ঞান অত্যন্ত ভারী বিষয়, আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের থেকে তা গোপন রাখা হয়েছে। সুতরাং কোন নবী-রাসূল বা ফেরেশতাকেও আল্লাহ্ সে জ্ঞান দেননি। আর যে কোন জ্ঞান গোপন রাখা হয় তা অন্তরের উপর ভারী হয়ে থাকে। দুই. কিয়ামত এত ভারী সংবাদ যে আসমান ও যমীন সেটাকে সহ্য করতে পারে না। কারণ, আসমানসমূহ ফেটে যাবে, তারকাসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। আর সাগরসমূহ শুকিয়ে যাবে। তিন. কিয়ামতের গুণাগুণ বর্ণনা আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের উপর কঠিন। চার. কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করা তাদের জন্য এক ভারী বিষয়। [ফাতহুল কাদীর]

তোমাদের উপর আসবে(১)।' আপনি এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞানী মনে করে তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। বলুন, 'এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আল্লাহ্‌রই নিকট,

---

(১) এ আয়াতে উল্লেখিত الساعة শব্দটি আরবী ভাষায় সামান্য সময় বা মুহূর্তকে বলা হয়। আভিধানিকভাবে যার কোন বিশেষ পরিসীমা নেই। আর গাণিতিকদের পরিভাষায় রাত ও দিনের চব্বিশ অংশের এক অংশকে বলা হয় "সা'আহ্", যাকে বাংলায় ঘন্টা নামে অভিহিত করা হয়। কুরআনের পরিভাষায় এ শব্দটি সে দিবসকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা হবে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যুদিবস এবং সেদিনকেও বলা হয় যাতে সমগ্র সৃষ্টি পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে। أيان (আইয়্যানা) অর্থ কবে। আর مُرسى (মুরসা) অর্থ অনুষ্ঠিত কিংবা স্থাপিত হওয়া। يُجَلِّيْهَا শব্দটি تجلية থেকে গঠিত। এর অর্থ প্রকাশিত এবং খোলা। بغتة (বাগতাতান) অর্থ অকস্মাৎ। حفي (হাফিয়্যূন) অর্থ আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেছেন, জ্ঞানী ও অবহিত ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে এমন লোককে 'হাফী' বলা হয়, যে প্রশ্ন করে বিষয়ের পরিপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করে নিতে পারে। [তাবারী] কাজেই আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, এরা আপনার নিকট কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, তা কবে আসবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন, এর নির্দিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার পালনকর্তারই রয়েছে। এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে কারো জানা নেই এবং সঠিক সময়ও কেউ জানতে পারবে না। নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তা প্রকাশ করে দেবেন। এতে কোন মাধ্যম থাকবে না। কেয়ামতের ঘটনাটি আসমান ও যমীনের জন্যও একান্ত ভয়ানক ঘটনা হবে। সেগুলোও টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকবে। সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার দাবী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, 'মানুষ নিজ নিজ কাজে পরিব্যস্ত থাকবে। এক লোক খরিদদারকে দেখাবার উদ্দেশ্যে কাপড়ের থান খুলে সামনে ধরে থাকবে, সে (সওদাগর) এ বিষয়টিও সাব্যস্ত করতে পারবে না, এরই মধ্যে কেয়ামত এসে যাবে। এক লোক তার উটনীর দুধ দুইয়ে নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনো তা ব্যবহার করতে পারবে না, এরই মধ্যে কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ নিজের হাউজ মেরামত করতে থাকবে- তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ হয়ত খাবারের লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেবার পূর্বেই কেয়ামত হয়ে যাবে। [বুখারীঃ ৬৫০৬, মুসলিমঃ ২৯৫৪] সুতরাং যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-ক্ষণ অনির্দিষ্ট ও গোপন রাখার মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে কেয়ামতকেও-যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুরই নামান্তর-তাকে গোপন এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান।

কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না⁽¹⁾ ।’

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ
اللّٰهُ ؕ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ
الْخَيْرِ ۛۚ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْٓءُ ۛۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ
وَّبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۠﴿١٨٨﴾

১৮৮. বলুন, ‘আল্লাহ্ যা ইচ্ছে করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই । আমি যদি গায়েবের খবর জানতাম তবে তো আমি অনেক কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না । ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া আমি তো আর কিছুই নই⁽²⁾ ।’

---

(১) বলা হয়েছে, আপনি লোকদিগকে বলে দিন যে, প্রকৃতপক্ষে কেয়ামতের সঠিক তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর কোন ফিরিশ্তা কিংবা নবী-রাসূলগণেরও জানা নেই । তবে হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিস ওয়াসাল্লামকে কেয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত জ্ঞান দান করা হয়েছে । আর তা হল এই যে, এখন তা নিকটবর্তী । এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বহু বিশুদ্ধ হাদীসে অত্যন্ত পরিস্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন । তিনি বলেছেনঃ ‘আমার আবির্ভাব এবং কেয়ামত এমনভাবে মিশে আছে, যেমন মিশে থাকে হাতের দু’টি আঙ্গুল’ ।[বুখারীঃ ৬৫০৩-৬৫০৫, মুসলিমঃ ২৯৫০]

(২) এ আয়াতে মুশরিক ও সাধারণ মানুষের সেই ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন করা হয়েছে; যা তারা নবী-রাসূলগণের ব্যাপারে পোষণ করত যে, তারা গায়েবী বিষয়েও অবগত রয়েছেন । তাদের এই শির্কী আকীদার খণ্ডন উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, ইলমে-গায়েব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপক ইলম শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলারই রয়েছে । এটা তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য । এতে কোন সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তা ফিরিশ্তাই হোক আর নবী ও রাসূলগণই হোক, শির্ক এবং মহাপাপ । তেমনিভাবে প্রত্যেক লাভ-ক্ষতি কিংবা মঙ্গল-অমঙ্গলের মালিক হওয়াও এককভাবে আল্লাহ্ তা‘আলারই গুণ । এতে কাউকে অংশীদার দাঁড় করানোও শির্ক । বস্তুতঃ এই শির্ক বা আল্লাহ্ রাব্বুল ‘আলামীনের সাথে কোন অংশীদারিত্বের আকীদাকে খণ্ডন করার জন্যই কুরআন নাযিল হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটেছে । তাই এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহিস ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি ‘আলেমুল-গায়েব নই যে, যাবতীয় পূর্ণ জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে । তাছাড়া আমার যদি গায়বী জ্ঞান থাকতই, তবে আমি প্রত্যেকটি লাভজনক বস্তুই হাসিল করে নিতাম, কোন একটি

চব্বিশতম রুকূ‘

১৮৯. তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়(১)। তারপর যখন সে তার সাথে সংগত হয় তখন সে এক হালকা গর্ভধারণ করে এবং এটা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে। অতঃপর গর্ভ যখন ভারী হয়ে আসে তখন তারা উভয়ে তাদের রব আল্লাহ্‌র কাছে

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ
مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ
حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ
رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

লাভও আমার হাতছাড়া হতে পারত না। আর প্রতিটি ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা রক্ষিত থাকতাম। কখনো কোন ক্ষতি আমার ধারে-কাছে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না। অথচ এতদুভয় বিষয়ের কোনটিই বাস্তব নয়। বহু বিষয় রয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা করতে পারেননি। তাছাড়া বহু দুঃখ-কষ্ট রয়েছে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পতিত হতে হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্‌রাম বেঁধে সাহাবায়ে কেরামের সাথে উমরা করার উদ্দেশ্যে হারাম শরীফের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যান, কিন্তু হারাম শরীফে প্রবেশ কিংবা উমরা করা তখনো সম্ভব হতে পারেনি; সবাইকে ইহ্‌রাম খুলে ফিরে আসতে হয়েছে। তেমনিভাবে ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হন এবং মুসলিমদেরকে সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়। এমনি আরো বহু অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে সংঘটিত হয়েছে। এ সবগুলো থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি গায়েবের জ্ঞান রাখেন না। শুধু ততটুকুই জানেন, যতটুকু আল্লাহ্ তাদের জানিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তাদেরকে জানিয়ে দেয়ার পর সেটা জানাকে আর গায়েবের জ্ঞান বলা যাবে না।

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাওয়াকে আদম থেকে সৃষ্টি করার কারণ হচ্ছে, তার কাছে গেলে মন প্রশান্ত হবে। তার সাথে সহজ সম্পর্ক তৈরী হবে, সন্তুষ্টি আসবে। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে যে, তিনি সন্তান-সন্ততিদেরকেও একই উদ্দেশ্যে মানুষকে প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, “আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং সৃজন করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহমর্মিতা। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।” [সূরা আর-রূম: ২১]

প্রার্থনা করে, ‘যদি আপনি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন তাহলে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব ।’

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَاۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿١٩٠﴾

১৯০. অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সুসন্তান দান করেন, তখন তারা তাদেরকে তিনি যা দিয়েছেন সেটাতে আল্লাহ্‌র বহু শরীক নির্ধারণ করে(১); বস্তুত তারা যাদেরকে (তাঁর সাথে) শরীক করে আল্লাহ্ তার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে(২) ।

---

(১) কাতাদা বলেন, হাসান বসরী বলতেন, এর দ্বারা ইয়াহূদী ও নাসারাদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে । আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সন্তান-সন্ততি দান করেন, কিন্তু তারা সেগুলোকে ইয়াহূদী কিংবা নাসারা বানিয়ে ছাড়ে । [তাবারী; ইবন কাসীর]

(২) ইয়াহূদী ও নাসারা ছাড়াও বাস্তবে যারাই আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামতকে অন্যের জন্য নির্দিষ্ট করে তারাও এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে । কারণ মহান সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহই সর্বপ্রথম মানব জাতিকে সৃষ্টি করেন । মুশরিকরাও এ কথা অস্বীকার করে না । তারপর পরবর্তী কালের প্রত্যেকটি মানুষকেও তিনি অস্তিত্ব দান করেন । আর একথাটিও মুশরিকরা জানে । তাই দেখা যায়, গর্ভাবস্থায় সুস্থ, সবল ও নিখুঁত অবয়বধারী শিশু ভূমিষ্ঠ হবার ব্যাপারে আল্লাহর উপরই পূর্ণ ভরসা করা হয় । কিন্তু সেই আশা পূর্ণ হয়ে যদি চাঁদের মত ফুটফুটে সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলেও জাহেলী কর্মকাণ্ড নবতর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে । কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন দেবী, অবতার, অলী ও পীরের নামে নজরানা ও শিন্নি নিবেদন করা হয় এবং শিশুকে এমন সব নামে অভিহিত করা হয় যেন মনে হয় সে আল্লাহর নয়, বরং অন্য কারোর অনুগ্রহের ফল । যেমন তার নামকরণ করা হয় হোসাইন বখশ, (হোসাইনের দান) পীর বখশ (পীরের দান), আব্দুর রাসূল (রাসূলের দাস), আবদুল উয্‌যা (উয্‌যার দাস), আবদে শামস (সূর্য দেবতার দাস) ইত্যাদি, ইত্যাদি ।

আরবের মুশরিক সম্প্রদায়ের অপরাধ ছিল এই যে, তারা সুস্থ, সবল ও পূর্ণ অবয়ব সম্পন্ন সন্তান জন্মের জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করতো কিন্তু সন্তানের জন্মের পর আল্লাহর এ দানে অন্যদেরকে অংশীদার করতো । নিঃসন্দেহে তাদের এ অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ । কিন্তু বর্তমানে তাওহীদের দাবীদারদের মধ্যে আমরা যে শির্কের চেহারা দেখছি তা তার চাইতেও খারাপ । এ তাওহীদের তথাকথিত দাবীদাররা সন্তানও চায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে । গর্ভ সঞ্চারের পর আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের নামে মানত মানে এবং সন্তান জন্মের পর তাদেরই আস্তানায় গিয়ে

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾

১৯১. তারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট(১),

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾

১৯২. ওরা না তাদেরকে সাহায্য করতে পারে আর না নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে(২)।

নজরানা নিবেদন করে। এরপরও জাহেলী যুগের আরবরাই কেবল মুশরিক, আর এরা নাকি পাক্কা তাওহীদবাদী !!

(১) এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা করছেন, যারা আল্লাহ্‌র সাথে মূর্তি, দেব-দেবী ইত্যাদিকে শরীক করে। অথচ তারা সৃষ্ট, মানুষের হাতের তৈরী। তারা কিছুরই মালিক নয়। ক্ষতি কিংবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। উপাসনাকারীদের পক্ষে প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তাদের নেই। বরং এগুলো হচ্ছে, মৃত। নড়াচড়া কিংবা শোনা বা দেখার ক্ষমতাও তাদের নেই। বরং উপাসনাকারীরা এগুলোর চেয়ে বেশী শক্তিশালী; কারণ তাদের চোখ আছে, কান আছে, তারা পাকড়াও করার ক্ষমতা রাখে। তাহলে তোমরা কিভাবে তাদের ইবাদত করছ যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করেনি? কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতাও যাদের নেই? [ইবন কাসীর] অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ তা'আলা অনুরূপ বলেছেন, "হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগের সাথে তা শোন: তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্র হলেও। এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের কাছ থেকে, এটাও তারা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষনকারী ও অন্বেষনকৃত কতই না দুর্বল; তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি যেমন মর্যাদা দেয়া উচিত ছিল, আল্লাহ্ নিশ্চয় ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।" [সূরা হজ-৭৩-৭৪] আল্লাহ্ বলেন, যে, তাদের উপাস্যগুলো সবাই একত্রিত হলেও কোন একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না। বরং যদি মাছি এ সমস্ত উপাস্যদের কোন নিকৃষ্ট খাবার নিয়ে উড়ে চলে যায়, তারা সেটাও মাছির কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। যার অবস্থা হচ্ছে এই, রিযক কিংবা সাহায্য লাভের জন্য কিভাবে ইবাদত তার করা হবে? [ইবন কাসীর]

(২) এমনকি কেউ তাদের ক্ষতি করতে চাইলেও তারা নিজেদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ সমস্ত মা'বুদদেরকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন এবং এ বিষয়টি নিয়ে মুশরিকদের উপাস্যদেরকে অপমান করতে ছাড়েন নি। আল্লাহ্ বলেন, "তারপর ইবরাহীম তাদের উপর সবলে আঘাত হানলেন।" [সূরা আস-সাফফাত: ৯৩] আরও বলেন, "তারপর তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন মূর্তিগুলোকে, তাদের প্রধানটি ছাড়া ; যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে।" [সূরা আল-আম্বিয়া: ৫৮] [ইবন কাসীর]

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَاءٌ
عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾

১৯৩. আর তোমরা তাদেরকে সৎপথে ডাকলেও তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে না; তোমরা ওদেরকে ডাক বা চুপ থাক, তোমাদের জন্য উভয়ই সমান(১)।

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ
أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪. আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরই মত বান্দা; সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাক, অতঃপর তারা যেন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ
بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ
كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

১৯৫. তাদের কি পা আছে যা দিয়ে ওরা চলে? তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে ওরা ধরে? তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে ওরা দেখে? কিংবা তাদের কি কান আছে যা দিয়ে ওরা শুনে? বলুন, 'তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্র শরীক করেছ তাদেরকে ডাক তারপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না(২)';

---

(১) অর্থাৎ মুশরিকদের বাতিল মা'বুদদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের পক্ষে কাউকে সঠিক পথ দেখানো এবং নিজেদের অনুগামী ও পূজারীদেরকে পথের সন্ধান দেয়া তো দূরের কথা, তারা তো কোন পথপ্রদর্শকের অনুসরণ করারও যোগ্যতা রাখে না। এমন কি কোন আহবানকারীর আহবানের জবাব দেবার ক্ষমতাও তাদের নেই। তাদেরকে কেউ ডাকল কি তাদেরকে পিষে ফেলল, সবই তাদের কাছে সমান। একথাটিই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পিতাকে বলেছিলেন, "যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, 'হে আমার প্রিয় পিতা ! আপনি তার 'ইবাদাত করেন কেন যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোন কাজেই আসে না?" [সূরা মারইয়াম:৪২] [ইবন কাসীর]

(২) এখানে আল্লাহ্ ছাড়া তারা যাদের আহ্বান করে, যাদের ইবাদত করে, যাদের প্রতি তাদের আশা-আকাঙ্খা ও ভয়-ভীতি পোষণ করে, তাদের অপারগতা ও অসহায়তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদের

إِنَّ وَلِـِّۧيَ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى
الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩٦﴾

১৯৬. 'আমার অভিভাবক তো আল্লাহ্ যিনি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন⁽¹⁾ ।

আহ্বান করে থাক, তাদের কি পাকড়াও করার মত সত্যিকারের হাত আছে? নাকি তাদের সত্যিকারের চোখ আছে যে, তারা দেখবে? নাকি তাদের সত্যিকারের কান আছে যে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে? মানুষের কাছে যে সমস্ত শক্তি আছে তাদের কাছে তো তাও নেই । যদি এগুলো তোমাদের কোন কাজেই না আসে, তোমাদের আহ্বানেও সাড়া না দেয়, তারা তোমাদের মতই বান্দা বরং তোমরা তাদের থেকেও পরিপূর্ণ, তাহলে কিসের ভিত্তিতে তোমরা তাদের ইবাদত কর? তোমরা ও তোমাদের উপাস্যরা একত্রিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, আমাকে কোন প্রকার অবকাশ দিও না । দেখতে পাবে যে, তোমরা আমার কোন ক্ষতি পৌঁছাতে সক্ষম নও । [সা'দী]

(১) এখানে 'ওলী' অর্থ রক্ষাকারী' সাহায্যকারী, অভিভাবক । আর 'কিতাব' অর্থ কুরআন । 'সালেহীন' অর্থ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমার ভাষায় সে সমস্ত লোক, যারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করে না । এতে নবী-রাসূল থেকে শুরু করে সাধারণ সৎকর্মশীল মুসলিম পর্যন্ত সবাই অন্তর্ভুক্ত । আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তোমাদের বিরোধিতার কোন ভয় আমার এ কারণেই নেই যে, আমার রক্ষাকারী, সাহায্যকারী ও অভিভাবক হলেন আল্লাহ্, যিনি আমার উপর কুরআন নাযিল করেছেন । এখানে আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত গুণাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে কুরআন নাযিল করার গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা যে আমার শত্রুতা ও বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে আছ তার কারণ হচ্ছে যে, আমি তোমাদেরকে কুরআনের শিক্ষা দেই এবং কুরআনের প্রতি আহ্বান করি । কাজেই যিনি আমার উপর কুরআন নাযিল করেছেন তিনিই আমার সাহায্যদাতা ও রক্ষণাবেক্ষণকারী । অতএব, আমার কি চিন্তা?

আয়াতের শেষ বাক্যটিতে একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে যে, নবী-রাসূলগণের মর্যাদা তো বহু উর্ধ্বে, সাধারণ সৎ মুসলিমদের জন্যও আল্লাহ্ সহায়, রক্ষাকারী ও অভিভাবক । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট । তিনিই আমার সাহায্যকারী, তাঁর উপরই আমার ভরসা । আর তাঁর কাছেই আমি আশ্রয় চাই । দুনিয়া ও আখেরাতে তিনিই আমার অভিভাবক । আর আমার পরে প্রত্যেক নেককার বান্দারও তিনি অভিভাবক । [ইবন কাসীর] এ আয়াতের সমর্থনে অন্যত্র এসেছে, "আমরা তো এটাই বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে ।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা শরীক কর, 'আল্লাহ্ ছাড়া । সুতরাং তোমরা সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর; তারপর

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿١٩٧﴾

১৯৭. আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং তারা তাদের নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا وَتَرٰىهُمْ
يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٩٨﴾

১৯৮. আর যদি আপনি তাদেরকে সৎপথে ডাকেন তবে তারা শুনবে না(১) এবং আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে; অথচ তারা দেখে না(২)।

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ
الْجٰهِلِيْنَ ﴿١٩٩﴾

১৯৯. মানুষের (চরিত্র ও কর্মের) উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন(৩)।

আমাকে অবকাশ দিও না। আমি তো নির্ভর করি আমার ও তোমাদের রব আল্লাহ্‌র উপর; এমন কোন জীব-জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয় ; নিশ্চয় আমার রব আছেন সরল পথে।” [সূরা হূদ: ৫৪-৫৬]

(১) অন্যত্রও আল্লাহ্ তা'আলা এ কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, “তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না।” [সূরা ফাতের: ১৪]

(২) অর্থাৎ এ উপাস্যদের দিকে তাকালে মনে হবে যেন, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। বস্তুত: তারা তাদের এ নির্জীব চোখ দিয়ে তোমাদের দিকে তাকাতে দেখলেও তারা কিন্তু তোমাদের দেখতে পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। [ইবন কাসীর]

(৩) আলোচ্য আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম চরিত্রের হেদায়াত দেয়া হয়েছে। [সা'দী] তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম নির্দেশ হচ্ছে, আপনি عفو গ্রহণ করুন। এখানে উল্লেখিত العفو শব্দটির আরবী অভিধান মোতাবেক একাধিক অর্থ হতে পারে এবং একত্রে সব ক'টি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। সে কারণেই তাফসীরবিদ আলেমগণের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। (এক) অধিকাংশ তাফসীরকার যে অর্থ নিয়েছেন তা হল এই যে, عفو বলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজকে, যা সহজে কোন রকম আয়াস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে। [ইবন কাসীর] তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি এমন বিষয় গ্রহণ করে নিন, যা মানুষ অনায়াসে করতে পারে। অর্থাৎ শরী'আত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে

আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবী করবেন না; বরং তারা সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। মুফাসসিরগণের মতে, এ আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষের আমল-আখলাকের ব্যাপারে সাধারণ আনুগত্য কবূল করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ] অর্থাৎ মানুষ যা করতে পারে তার প্রকাশ্য রূপ দেখেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। তাদের প্রকৃতি যেটা করতে সমর্থ নয় সেটা তাদের উপর চাপিয়ে দেব না। তাদের ভুল-ত্রুটি হলে সেটা উপেক্ষা করে যাব। তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করব না [ইবন কাসীর; সা'দী; ফাতহুল কাদীর] (দুই) عفو এর অপর অর্থ ক্ষমা করা এবং অব্যাহতি দেয়াও হয়ে থাকে। তাফসীরকার আলেমগণের এক দল এক্ষেত্রে এ অর্থেই বাক্যটির মর্ম সাব্যস্ত করেছেন এই যে, আপনি পাপী-অপরাধীদের ক্ষমা করে দিন। [ইবন কাসীর, যায়দ ইবন আসলাম হতে]

আয়াতের দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে, আপনি عرف এর নির্দেশ দিন। এখানে العرف শব্দটির অর্থ, সৎকাজ বা পরিচিত কাজ। যে কোন ভাল ও প্রশংসনীয় কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। [ইবন কাসীর] অর্থাৎ যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে সৎকাজেরও উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায়নীতির মাধ্যমেই নয়; বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন।

আয়াতের তৃতীয় নির্দেশ হচ্ছে, আপনি জাহেল বা মূর্খদেরকে উপেক্ষা করুন। যারা জাহেল তাদের কাছ থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে, আপনি অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে কল্যাণকর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন এবং একান্ত কোমলতার সাথে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের বিষয় বাতলে দিন। কিন্তু বহু মূর্খ এমনও থাকে যারা এহেন ভদ্রোচিত আচরণে প্রভাবিত হয় না; বরং এমতাবস্থায়ও তারা মূর্খজনোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এমন ধরনের লোকদের সাথে আপনার আচরণ হবে এই যে, তাদের হৃদয়বিদারক মূর্খ-জনোচিত কথা-বার্তায় দুঃখিত হয়ে তাদেরই মত ব্যবহার আপনিও করবেন না; বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন। তাফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে-কাসীর রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ দূরে সরে থাকার অর্থও মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের হেদায়াত করাও বর্জন করতে হবে। কারণ, এটা রিসালাত ও নবুওয়তের দায়িত্ব এবং মর্যাদার যোগ্য নয়।

এক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা রয়েছে যে, উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর খেলাফত আমলে উয়াইনাহ্ ইবনে হিসন একবার মদীনায় আসে এবং স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র হুর ইবন কায়সের মেহমান হয়। হুর ইবনে কায়স ছিলেন সে সমস্ত বিজ্ঞ আলেমদের একজন যারা ফারূকে আযম রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়াইনাহ্ স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

২০০. আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ(১)।

হুরকে বললঃ তুমি তো আমীরুল মু'মীনের একজন অতি ঘনিষ্ঠ লোক; আমার জন্য তার সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এসো। হুর ইবনে কায়স রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমার চাচা উয়াইনাহ্ আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চান। তখন তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু উয়াইনাহ্ উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর দরবারে উপস্থিত হয়েই একান্ত অমার্জিত ও ভ্রান্ত কথাবার্তা বলতে লাগল যেঃ 'আপনি আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, না করেন আমাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাফের আচরণ'। উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার এসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে হুর ইবন কায়স নিবেদন করলেনঃ 'হে আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেছেন, "আপনি ক্ষমা করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন" আর এ লোকটিও জাহেলদের একজন'। এই আয়াতটি শোনার সাথে সাথে উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সমস্ত রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোন কিছুই বললেন না। উমার ফারূক রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল যে, আল্লাহ্‌র কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন উৎসর্গিত প্রাণ। [বুখারীঃ ৪৬৪২]

(১) এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ, এতে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, যারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করে এবং মূর্খজনোচিত ব্যবহার করে, তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না। এ বিষয়টি মানব প্রকৃতির পক্ষে একান্তই কঠিন। বিশেষতঃ এমন পরিস্থিতিতে সৎ এবং ভাল মানুষদেরকেও শয়তান রাগান্বিত করে লড়াই-ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করেই ছাড়ে। সে জন্যই পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, যদি এহেন মুহূর্তে রোষানল জ্বলে উঠতে দেখা যায়, তবে বুঝবেন শয়তানের পক্ষ থেকেই এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হল আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাওয়া, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, দু'জন লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস ওয়াসাল্লামের সামনে ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ 'আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি সে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার এই উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। তারপর বললেনঃ বাক্যটি হল এই أَعُوذُ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم সে লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি উচ্চারণ করল। তাতে সাথে সাথে তার রোষানল প্রশমিত হয়ে গেল। [বুখারীঃ ৩২৮২, ৬০৪৮, ৬১১৫, মুসলিমঃ ২৬১০, ইবন হিব্বানঃ ৫৬৯২, আবু দাউদঃ ৪৭৮০, তিরমিযীঃ ৩৪৫২,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا۟ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ٢٠١

২০১. নিশ্চয় যারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করেছে, তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা⁽¹⁾ দেয় তখন তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং সাথে সাথেই তাদের চোখ খুলে যায়⁽²⁾।

وَإِخْوَٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِى ٱلْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ٢٠٢

২০২. তাদের সঙ্গী-সাথীরা তাদেরকে ভুলের দিকে টেনে নেয়। তারপর এ বিষয়ে তারা কোন ত্রুটি করে না⁽³⁾।

মুসনাদে আহমাদঃ ৫/২৪৪,নাসায়ী, আমলুল ইয়াওমে ওয়াল্লাইলাঃ৩৯৩] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়ালে তিনবার তাকবীর বলতেন, তিনবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতেন, সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী তিনবার বলতেন, তারপর বলতেনঃ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ অর্থাৎ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় চাই, তার কুমন্ত্রণা হতে, অহংকার হতে, তার হাতে মৃত্যু হওয়া থেকে। [আবু দাউদঃ ৭৬৪, ইবন মাজাহঃ ৮০৭, মুসনাদে আহমাদঃ ৪/৮৫]

(১) মূল আরবী হচ্ছে, طائف। মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ ক্রোধ। [তাবারী] ইবন আব্বাস বলেন, এর অর্থ শয়তানের কোন ছোঁয়া বা স্পর্শ। [তাবারী]

(২) শয়তান যেহেতু ইসলামের পথের দিকে দাওয়াত দেয়ার কাজটির উন্নতি কখনো দু'চোখে দেখতে পারে না তাই সে হামেশাই এ ব্যাপারে প্রতিকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যারা মুত্তাকী তারা নিজেদের মনে কোন শয়তানী প্ররোচনার প্রভাব এবং কোন অসৎ চিন্তার ছোঁয়া অনুভব করতেই সাথে সাথেই সজাগ হয়ে উঠে। তারপর এ পর্যায়ে কোন্ ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বনে দ্বীনের স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং সত্য প্রীতির প্রকৃত দাবী কি তা তারা পরিষ্কার দেখতে পায়। তারা তাওবা করে এবং প্রচুর পরিমাণে সৎকাজ করে। ফলে শয়তান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে যাদের কাজের সাথে স্বার্থপ্রীতি অংগাংগীভাবে জড়িত এবং এ জন্য শয়তানের সাথে যাদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তারা অবশ্যি শয়তানী প্ররোচনার মোকাবিলায় টিকে থাকতে পারে না এবং তার কাছে পরাজিত হয়ে ভুল পথে পা বাড়ায়। একের পর এক খারাপ ও পাপের পথে শয়তান তাদেরকে নিয়ে যায়। এসব কাজ করতে তারা সামান্যতমও পিছপা হয় না। সুতরাং শয়তান তাদের পথভ্রষ্টতায় কমতি করে না। আর তারাও খারাপ কাজে যেতে কসূর করে না। [সা'দী]

(৩) অর্থাৎ শয়তান মানুষদের মধ্যে যাদেরকে তাদের অনুগত পায়, তাদেরকে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত করতেই থাকে। তারপর শয়তানরা তাদেরকে প্ররোচনা দিতেই থাকে,

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ؕ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾

২০৩. আপনি যখন তাদের কাছে (তাদের চাওয়া মত) কোন আয়াত(১) নিয়ে আসেন না, তখন তারা বলে, 'আপনি নিজেই একটি আয়াত বানিয়ে নেন না কেন?' বলুন, 'আমার রবের পক্ষ থেকে যা আমার কাছে ওহী হিসেবে প্রেরণ করা হয়, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি। এ কুরআন তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ। আর হিদায়াত ও রহমত এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান আনে(২)।

এ ব্যাপারে তারা কোন প্রকার কমতি করে না। অনুরূপভাবে শয়তানের অনুসারীরাও শয়তানরা তাদেরকে যে সমস্ত গৰ্হিত কাজের প্ররোচনা দেয় সেগুলোর উপর আমল করতে সামান্যতম কুণ্ঠিত হয় না। [মুয়াসসার] সুতরাং অন্যায় কাজে তারা একে অপরের সহযোগী। তারা সর্বক্ষণ পথভ্রষ্টতাতেই লিপ্ত থাকে। তাদের কাছে কোন প্রকার ওয়ায নসীহত আসলেও তা কাজে লাগে না। ওয়ায ও নসীহত তাদের চক্ষু খুলে দেয় না, যেমনটি পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়লেও ওয়ায-নসীহত পেলে তাদের চোখ খুলে যায় এবং তারা অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসে। কিন্তু যারা খারাপ লোক তারা শয়তানের প্ররোচনা ও ভ্রষ্টতাতেই লিপ্ত থাকে। তারা কখনো চক্ষুষ্মান হয় না। [জালালাইন]

(১) এখানে আয়াত বলে মু'জিযা ও অলৌকিক কিছু প্রদর্শনের কথা বোঝানো হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "আমরা ইচ্ছে করলে আসমান থেকে তাদের কাছে এক নিদর্শন নাযিল করতাম, ফলে সেটার প্রতি তাদের ঘাড় বিনত হয়ে পড়ত" [সূরা আশ-শু'আরা:৪] কারণ মক্কার কুরাইশ ও কাফেররা সবসময় এটা বলত যে, আপনি কষ্ট করে এমন একটি মু'জিযা নিয়ে আসেন না কেন, যা দেখে আমরা ঈমান আনতে বাধ্য হয়ে যাই। এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে বলছেন যে, আপনি বলুন, মু'জিযা নিয়ে আসা আমার কাজ নয়। আমি তো শুধু আমার রবের ওহীর অনুসরণ করি। তিনি যদি কোন মু'জিযা আমাকে প্রদান করেন আমি সেটা গ্রহণ করি। আর যদি না দেন তবে আমি নিজের পক্ষ থেকে সেটা চেয়ে নেই না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা কুরআন গ্রহণ করার প্রতি পথনির্দেশ করলেন। [ইবন কাসীর]

(২) অর্থাৎ এই কুরআন তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আগত বহুবিধ দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনের এক সমাহার। এতে সামান্য লক্ষ্য করলেই একথা বিশ্বাস না করে উপায়

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

২০৪. আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শুন এবং নিশ্চুপ হয়ে থাক যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়⁽¹⁾।

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً

২০৫. আর আপনি আপনার রবকে নিজ মনে স্মরণ করুন⁽²⁾ সবিনয়ে, সশংকচিত্তে

থাকে না যে, এটি যথার্থই আল্লাহ্‌র কালাম। এতে কোন সৃষ্টিরই কোন হাত নেই। অতঃপর বলা হয়েছেঃ এই কুরআন সারা বিশ্বের জন্য সত্য দলীল তো বটেই, তদুপরি যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহ্‌র রহমত ও হেদায়াত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার অবলম্বনও বটে।

(১) এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুরআন মুমিনদের জন্য রহমত। কিন্তু এই রহমতের দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত ও প্রক্রিয়া রয়েছে, যা সাধারণ সম্বোধনের মাধ্যমে এভাবে বলা হয়েছে- "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা সবাই তার প্রতি কান লাগিয়ে চুপচাপ থাকবে"। তবে আয়াতের হুকুমটি কি সালাতের কুরআন পাঠ সংক্রান্ত, না কোন বয়ান-বিবৃতিতে কুরআন পাঠের ব্যাপার, নাকি সাধারণভাবে কুরআন পাঠের বেলায়; তা সালাতেই হোক অথবা অন্য যে কোন অবস্থায় হোক। এ ব্যাপারে মত পার্থক্য রয়েছে। [বিস্তারিত জানার জন্য তাফসীর ইবন কাসীর দ্রষ্টব্য] এখানে প্রকৃত বিষয় হল এই যে, কুরআনুল কারীমকে যাদের জন্য রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেজন্য শর্ত হচ্ছে যে, তাদেরকে কুরআনের আদব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে। আর কুরআনের বড় আদব হলো এই যে, যখন তা পাঠ করা হয়, তখন শ্রোতা সেদিকে কান লাগিয়ে নিশ্চুপ থাকবে। [সা'দী]

(২) স্মরণ করা অর্থ নামাযও এবং অন্যান্য ধরনের স্মরণ করাও। চাই মুখে মুখে বা মনে মনে যে কোনভাবেই তা হোক না কেন। সকাল-সাঁঝ বলতে সুনির্দিষ্টভাবে এ দু'টি সময়ও বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। আর এ দু' সময়ে আল্লাহর স্মরণ বলতে বুঝানো হয়েছে সকালের ও বিকালের নামাযকে। [তাবারী] অনুরূপ অর্থে অপর সূরায় এসেছে, "এবং আপনার রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে" [সূরা কাফ: ৩৯] পক্ষান্তরে সকাল-সাঁঝ কথাটা "সর্বক্ষণ" অর্থেও ব্যবহৃত হয় [কাশশাফ] এবং তখন এর অর্থ হয় সবসময় আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকা। এর উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে, তোমাদের অবস্থা যেন গাফেলদের মত না হয়ে যায়। দুনিয়ায় যা কিছু গোমরাহী ছড়িয়েছে এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রে ও কর্মকাণ্ডে যে বিপর্যয়ই সৃষ্টি হয়েছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, মানুষ ভুলে যায়, আল্লাহ তার রব, সে আল্লাহর বান্দা, দুনিয়ার জীবন শেষ হবার পর তাকে তার রবের কাছে হিসাব দিতে হবে।

وَدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ﴿٢٠٥﴾

ও অনুচ্চস্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ۩ ﴿٢٠٦﴾

২০৬. নিশ্চয় যারা আপনার রবের সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তাঁর ইবাদাতের ব্যাপারে অহঙ্কার(১) করে না। আর তারা তাঁরই তাসবীহ পাঠ করে(২) এবং তাঁরই জন্য সিজ্‌দা(৩) করে।

---

(১) যারা আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছেন তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ। সে হিসেবে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করা ও রবের বন্দেগী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া শয়তানের কাজ। এর ফল হয় অধঃপতন ও অবনতি। পক্ষান্তরে আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়া এবং তাঁর বন্দেগীতে অবিচল থাকা একটি ফেরেশ্‌তাসুলভ কাজ। এর ফল হয় উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভ। যদি তোমরা এ উন্নতি চাও তাহলে নিজেদের কর্মনীতিকে শয়তানের পরিবর্তে ফেরেশ্‌তাদের কর্মনীতির অনুরূপ করে গড়ে তোল।

(২) আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করে অর্থাৎ আল্লাহ যে ত্রুটিমুক্ত, দোষমুক্ত, ভুলমুক্ত সব ধরনের দুর্বলতা থেকে তিনি যে একেবারেই পাক-পবিত্র এবং তিনি যে লা-শরীক, তুলনাহীন ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, এ বিষয়টি সর্বান্তকরণে মেনে নেয়। মুখে তার স্বীকৃতি দেয় ও অংগীকার করে এবং স্থায়ীভাবে সবসময় এর প্রচার ও ঘোষণায় সোচ্চার থাকে।

(৩) এখানে সালাত সংক্রান্ত ইবাদাতের মধ্য থেকে শুধু সিজ্‌দার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সালাতের সমগ্র আরকানের মধ্যে সিজ্‌দার একটি বিশেষ ফযীলত রয়েছে। হাদীসে রয়েছে যে, 'কোন এক লোক সওবান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমাকে এমন একটা আমল বাতলে দিন যাতে আমি জান্নাতে যেতে পারি। সওবান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নীরব রইলেন; কিছু বললেন না। লোকটি আবার নিবেদন করলেন, তখনও তিনি চুপ করে রইলেন। এভাবে তৃতীয়বার যখন বললেন, তখন তিনি বললেনঃ আমি এ প্রশ্নটিই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে করেছিলাম। তিনি আমাকে ওসীয়ত করেছিলেন যে, অধিক পরিমাণে সিজ্‌দা করতে থাক। কারণ, তোমরা যখন একটি সিজ্‌দা কর তখন তার ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মর্যাদা এক ডিগ্রি বাড়িয়ে দেন এবং একটি গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন। লোকটি বললেনঃ সওবান রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে আলাপ করার পর আমি আবুদদারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করে তার কাছেও একই নিবেদন করলাম এবং তিনিও একই উত্তর দিলেন। [মুসলিমঃ ৪৮৮]
অন্য এক হাদীসে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

---

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘বান্দা স্বীয় রবের সর্বাধিক নিকটবর্তী তখনই হয়, যখন সে বান্দা সিজ্‌দায় অবনত থাকে। কাজেই তোমরা সিজ্‌দারত অবস্থায় খুব বেশী করে দো‘আ-প্রার্থনা করবে। তাতে তা কবুল হওয়ার যথেষ্ট আশা রয়েছে। [মুসলিমঃ ৪৭৯, ৪৮২]

সুরা আল-আ‘রাফের শেষ আয়াতটি হল আয়াতে সিজ্‌দা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘কোন আদম সন্তান যখন কোন সিজ্‌দার আয়াত পাঠ করে অতঃপর সিজ্‌দায়ে তেলাওয়াতে সম্পন্ন করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এবং বলে যে, আফসোস, মানুষের প্রতি সিজ্‌দার হুকুম হল আর সে তা আদায়ও করল, ফলে তার ঠিকানা হল জান্নাত, আর আমার প্রতিও সিজ্‌দার হুকুম হয়েছিল, কিন্তু আমি তার না-ফরমানী করেছি বলে আমার ঠিকানা হল জাহান্নাম।’ [মুসলিমঃ ১৩৩]